সব চেয়ে যা বড়ো

সব চেয়ে যা বড়ো (২)

প্রতিভা বসু



ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই বৈশাখ
১৮৭৯ শকাব্দ

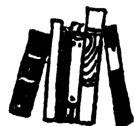
এক টাকা
আট আনা

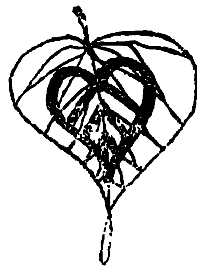
প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

চিত্রাঙ্কন :
জ্যোতির্ময়
দত্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীঅজিত ঘোষ
শরৎ-প্রকাশ মুদ্রণী
৬৪।এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩







সব চেয়ে যা বড়ো

গভীর রাত্রে জেগে-জেগে শেষে সুকৃতির কানা চোখ জলে ভ'রে গেলো। আর পাঁচজন নরম হৃদয়ের স্বাভাবিক চেহারার মেয়েদের মতো তার হৃদয়ও বিধুর হ'য়ে উঠলো বেদনায়। যা ঈশ্বর দেননি তা আর পাবে কেমন ক'রে, কিন্তু কেউ তো বোঝে না সে-কথা—আর কেন বোঝে না সে-কথা ভাবতে-ভাবতে উদ্বেলিত হৃদয়ে প'ড়ে রইলো চুপ ক'রে। লাঞ্ছিত বিড়ম্বিত জীবনের ভার মনে হ'লো বড়োই দুঃসহ! তারপর অন্ধকার ঘরে একা বিছানায় ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

সব জায়গাতেই এই এক কষ্ট। যেখানে গিয়েই সে কাজ নিয়েছে, কয়েক মাসের মধ্যেই অসহ্য হ'য়ে উঠেছে তার জীবন। মুখের দিকে তাকিয়েই সকলের চোখে এমন এক বিস্ময় নামে কেন? আর তারপরেই অদম্য হাসির আবেগে তারা কেন চক্ষু নত করে? কী, কী আছে এই মুখে। কুৎসিত কি আর কেউ নেই এ-জগতে? মানুষ কি তার নাক চোক মুখ দিয়েই মানুষ! তার বিদ্যা, তার বুদ্ধি, হৃদয়বৃত্তির কোমলতা, তার কি কোনোই মূল্য নেই, মানুষ কি দেখতে পায় না তার হৃদয়ের উত্তাপ?—সেও যে ভালোবাসতে পারে—দুঃখ পেতে পারে—এ-কথা কেন তারা বিশ্বাস করে না? কেন করে না? কান্নার বেগ আরো প্রবল হ'লো তার।

রাত গভীর হয়েছে, এত বড়ো বোর্ডিংটির এতগুলো মেয়ে আর এতগুলো শিক্ষয়িত্রী সব যেন মায়াস্পর্শে নিথর। একা—মাত্র একা ঘুম নেই তার চোখে। সে জেগে আছে ব্যথিত অন্তরে ঈশ্বরের কৃপণতায় মর্মাহত হ'য়ে। এক সময় উঠে বসলো সে—তারপর অশ্রুভরা চোখে আলো জ্বেলে ধীর পায়ে দাঁড়ালো গিয়ে আয়নার কাছে। শ্রীহীন মুখ আর একটি নষ্ট চোখ নিয়েই সে জন্মেছিলো এবং জন্মের অনতিপরেই মার

কোল থেকে মুখ থুবড়ে গরম দুধের কড়াইতে প'ড়ে গিয়ে একটি গাল আর গলার অর্ধেক পুড়ে গিয়েছিলো তার। ঘা শুকিয়ে গেলো মাস-খানেকের মধ্যেই—কিন্তু পোড়ার দাগ মিলোলো না এই—আটতিরিশ বছর বয়সেও। এক গালের রং রইলো অসম্ভব কালো—আরেকটি গাল শাদা আর কালোর অসংগতিতে বীভৎস। আয়নায় ছায়া পড়লো সেই মুখের, সুকৃতি স্তব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সেই ছায়ার দিকে।



সে জেগে আছে ব্যথিত অন্তরে……

ক্লাশে গেলে মেয়েরা যে ঢেউ হ'য়ে ওঠে—একটা চাপা-হাসির তরঙ্গ যে প্রত্যেকটি শরীরের উপর দিয়ে ব'য়ে-ব'য়ে যায় তার একটা সংগত কারণ আছে বইকি। কোনো শিক্ষয়িত্রী যে কখনোই তার সঙ্গে ব'সে দুটো কথা বলবার অবকাশ পান না তাও অসংগত নয়। যখন ছোটো ছিলো—কোনো বন্ধু ছিলো না তার,

ইস্কুলে-কলেজে এতো বছরের মধ্যে এমন কারো সংস্পর্শ ঘটেনি তার জীবনে, যে এই চেহারার গণ্ডি অতিক্রম ক'রে তার হৃদয়ের কাছে এসেছে, ভালোবেসেছে আর-পাঁচজন মানুষের মতো। তারপর এলো এই কর্মজীবন। এই নিয়ে পাঁচটা ইস্কুল সে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু এর পর? এর পর সে যাবে কোথায়? বিশ্বসংসারে এমন তো কেউ নেই তার যেখানে গিয়ে আত্মগোপন ক'রে ছুটি খেতে পাবে! বিধবা মা কবে মারা গেছেন, ভাইয়ের স্ত্রীরা ভালোবাসে না তাকে। তবে কোথায় সে যাবে? নির্মম ঈশ্বরের কাছে মনে-মনে নতজানু হ'য়ে আয়নায় প্রতিফলিত মুখের উপর চোখ রেখে সে এই প্রশ্ন করলো।

তিন মাস এখানে এসেছে কাজ নিয়ে, দুরন্ত মেয়েরা যে কী দুর্ব্যবহার করে তার সঙ্গে তার আর কোনো তালিকা নেই—তাদের নিষ্ঠুরতা পর্বতের মতো। ঠাট্টা-বিদ্রূপ—বোর্ডে ছবি এঁকে রাখা—বড়ো-বড়ো অক্ষরে নামকরণ, ক্লাশে গেলে নিজেদের মধ্যে বিশেষ ভাষার আদান-প্রদান—রহস্যময় দৃষ্টিক্ষেপ,—সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে যে যেখান থেকে পারছে ছুঁড়ে মারছে হাসির তুবড়ি—অবহেলা অশ্রদ্ধার কঠিন আঘাত। প্রথম-প্রথম সহ্যের প্রতিমূর্তি হ'য়ে ছিলো সে—যেন দেখেনি, যেন বোঝেনি, হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে চেষ্টা করেছিলো স্নেহপাশে তাদের আবদ্ধ করতে; কিন্তু অসম্ভব। দল পাকিয়ে-পাকিয়ে মেয়েগুলো অবিরাম হাসাহাসি করে—টেপাটেপি ক'রে গায়ে-গায়ে গড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া আছে ভৃত্যমহল, আছেন হেডমিস্ট্রেস্ নিজে—ইস্কুলের অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ—কারো হাত থেকেই রেহাই নেই এই চেহারা নিয়ে। তার চলতে পা কাঁপে, অকারণে সন্দেহ হয়, পা টিপে-টিপে প্রত্যেক ঘরে গিয়ে কান পাতে তাদের হাসির শব্দ শুনতে।

কিন্তু সেদিন হ'লো চরম। রবিবারের ছুটি, মেয়েরা নিয়ম-মতো একটুখানি পড়াশুনো করলো কি করলো না—সময়-মতো খেয়ে নিলো

তাড়াতাড়ি—তারপর নাইন আর টেনের মেয়েরা জুটলো এসে এক ঘরে। সুপারিনটেনডেণ্ট কয়েক ঘণ্টার জন্য বাইরে গেছেন, তাছাড়া বোর্ডিংয়ের যে-ক'জন শিক্ষয়িত্রী আছেন তাঁরা বলতে গেলে কোনো রবিবারেই বোর্ডিংয়ে থাকেন না। তাঁদের জীবনে আত্মীয় আছে, বন্ধু আছে—আছে প্রীতিভাজন, স্নেহভাজন, নতুন-নতুন আস্বাদ—তারা কেন লোকলজ্জায় মুখ লুকিয়ে প'ড়ে থাকবে বোর্ডিংয়ের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে আবদ্ধ হ'য়ে? আধ-পোড়া গাল আর দুঃখভরা নিঃসঙ্গতা নিয়ে একলা ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে প'ড়ে থাকে কেবল সুকৃতি। যথারীতি সেদিনও সবাই অনুপস্থিত—সুকৃতির পাশের বড়ো হল-ঘরটায় এসে মেয়েরা দরজা বন্ধ ক'রে দিলো। তারপর উঠলো তাদের সমবেত কণ্ঠের কোলাহল। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ছিলো সুকৃতি, শেষে অসহ্য হ'য়ে উঠে এসে বন্ধ দরজায় টোকা দিলো। কিন্তু তার সেই মৃদু টোকা অতগুলো মেয়ের উচ্চহাসির দমকে কোথায় তলিয়ে গেলো। অত্যন্ত রাগ হ'লো তার। এ কী অসভ্যতা—পাশের ঘরে একজন গুরুস্থানীয় বিশ্রাম করছেন, এত বড়ো ধেড়ে মেয়েগুলোর কি সেটুকু মর্যাদাবোধও নেই? জোরে সে ধাক্কা দিলো দরজায় আর ভেজানো দরজা সঙ্গে-সঙ্গে খুলে হাঁ হ'য়ে গেলো। সে দেখতে পেলো, ক্লাশ সেভেনের ছোটো যূথিকার এক গালে কালো কালি মাখানো হয়েছে, আরেক-গালে কালির ফাঁকে-ফাঁকে চুনের ছিটে লাগিয়ে এক বীভৎস মূর্তি ক'রে সাজিয়েছে তারা। শাদা কালোপাড় শাড়ি (সাধারণত যা সে পরে) সোজা ড্রেস ক'রে পরিয়ে বসিয়েছে একটা চেয়ারে—এক-একবার মুখ বিকৃত ক'রে কী ব'লে উঠছে সে, সঙ্গে-সঙ্গে অতগুলো মেয়ে একসঙ্গে হেসে উঠে গড়িয়ে পড়ছে এ-ওর গায়ে। এক পলক তাকিয়ে সুকৃতির যেন আগুন ধ'রে গেলো মাথার মধ্যে—অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রগতিতে ঢুকলো সে ঘরের মধ্যে—কোনোদিকে না-তাকিয়ে ছুটে সে এগিয়ে এলো যূথিকার কাছে, তারপর একেবারে ক্ষিপ্তের মতো এলোপাথাড়ি চড়ে-কিলে কানমলায়

উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দিলো মেয়েটিকে। আর সব মেয়ে পাথরের মতো স্তব্ধ। যখন সে থামলো, ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর-মন যেন আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো। দাঁড়ালো না, বেগে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে, তারপর নিজের ঘরে গিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো।

একটু চুপচাপ। এমন চুপচাপ যে, সারা বোর্ডিং-বাড়িটায় যেন গভীর রাতের ছম্‌ছমানি নামলো। পরক্ষণেই বন্ধ দরজার বাইরে ভিড় ক'রে এসে দাঁড়ালো সমস্ত বোর্ডিং—বড়ো মেয়েদের বিদ্রোহী গলা তীরের মত এসে বিঁধলো স্বকৃতির বুকের মধ্যে, 'খুলুন, দরজা খুলুন, নয়তো ভেঙে ফেলবো দরজা, সাহস থাকে ত বেরিয়ে আসুন না'! সম্ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে দুমদাম ধাক্কা পড়তে লাগলো দরজার বাইরে। একখণ্ড পাথরের মত নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো স্বকৃতি—খিলও খুললো না, জবাবও দিলো না। গালা-গালি, চেঁচামেচি, বেড়ালের ডাক, কুকুরের ডাক—দরজায় লাথি—প্রায় একঘণ্টা চললো এই অসভ্যতা আর প্রতিবাদের তাণ্ডবলীলা, তারপর ধীরে-ধীরে শান্ত হ'লো কলরোল। স্বকৃতি এবার বসলো এসে খাটের উপর, জানালা দিয়ে চেয়ে রইলো বাইরের শাদা আকাশের দিকে, চোখের দৃষ্টিতে যেন সুখ-দুঃখের প্রশ্ন জীবন থেকে সে মুছে ফেলেছে।

একটু পরেই বাজলো বিকেলের ঘণ্টা—মেয়েরা খেতে যাচ্ছে—তাদের পায়ের দুপদাপ শব্দ সে কান পেতে শুনলো—কেমন জোরে-জোরে নিশ্বাস বেরুতে লাগলো বুকের ভিতর থেকে—চুপ ক'রে শুয়ে পড়লো সে।

সন্ধের আগেই ফিরে এলেন সব মিস্ট্রেসরা—সুপারিনটেনডেণ্ট সব কথা শুনলেন মনোনিবেশ সহকারে—মেট্রন চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে মেয়েদের পক্ষ নিয়ে কথা বললেন—স্বকৃতি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও সবই টের পেলো, আর নিজেকে প্রস্তুত করবার শক্তি খুঁজতে লাগলো ভিতরে-ভিতরে।

'মিস সেন!' দরজার বাইরে থেকে বোর্ডিং-সুপারিনটেনডেণ্টের গম্ভীর আওয়াজ ভেসে এলো ঘরের মধ্যে। বুকের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা স্রোত ব'য়ে

গেলো সুকৃতির। 'মিস সেন!' ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে মিসেস চ্যাটার্জি আবার ডাকলেন। 'হাঁ, খুলছি'—অসংবৃত শাড়ি ঠিক ক'রে নিয়ে দরজা খুলে দিল সুকৃতি; ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'আসুন।'

মিসেস চ্যাটার্জির সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্য মিস্ট্রেসরাও এলেন—আর এলো নাইন-টেনের মেয়ে ক'টি। মিসেস চ্যাটার্জি প্রথমটায় ভদ্রভাবেই এই মার-ধোরের কৈফিয়ৎ তলব করেছিলেন, কল্‌কলিয়ে উঠলো মেয়েগুলো। সুকৃতি বললো, 'বলবার জন্যে ত এদেরই নিয়ে এসেছেন।'

'আমরা! নিশ্চয়ই আমরা আসবো,'—চোখে-মুখে কথা ব'লে উঠলো সুপ্রীতি মিত্র (ক্লাশ টেনের পাণ্ডা), 'আপনি ভেবেছেন কী? যা খুশি তাই ক'রে অমনি-অমনিই সেরে যাবেন?'

'না, তা ভাবিনি—' অত্যন্ত শান্তগলায় সুকৃতি বললো, 'ভেবেছি যে, তোমাদের মতো অসভ্য মেয়েদের কণ্ট্রোল করতে হ'লে উঠতে-বসতে চাবুক মারা উচিত।'

'কী, কী, বললেন?' সব কটি মেয়ে রুখে উঠলো একযোগে। মিসেস চ্যাটার্জি উষ্ণগলায় বললেন, 'মেয়েদের কাছে অপমানিত হ'য়ে কোন গৌরব নেই, মিস সেন—নিজের সম্মান নিজের কাছেই—আপনি ভালো ক'রে কথা বলতে শিখুন।'

'আমার কি আর শিক্ষা নেবার বয়স আছে? শিক্ষিত হতে ত আমি আসিনি, শিক্ষা দিতেই এসেছি।'

'কী রে আমার—' একটি মেয়ে মুখব্যাদন ক'রে হাতের পাতা উল্‌টোলো—অন্যান্যরা মুচকি হাসি দিয়ে বড়ো হাসি গোপন করলো।

মিসেস চ্যাটার্জি অপমানিত বোধ করলেন সুকৃতির কথায়—তাঁর কণ্ঠস্বরে ক্রোধ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, 'হ্যাঁ—শিক্ষিত করবার ভার যাতে আর আপনার হাতে না থাকে তারই ব্যবস্থা করতে হবে। হেডমিস্ট্রেসকেও খবর পাঠানো হয়েছে—'

'আর একদিনও যদি ওঁকে রাখা হয়—' গ'র্জে উঠলো মেয়েরা—'সব মেয়ে আমরা বোর্ডিং ছেড়ে দেবো—ইস্কুলে কোন ক্লাশ করবো না—দেখবো কী ক'রে আপনারা চালান।'

'চুপ করো—' একজন মিস্ট্রেস ধমক দিয়ে উঠলেন, 'তোমরা তো যা বলবার বলেইছো—আবার কেন জটলা করছো এখানে এসে!' ধমক খেয়ে সচকিত হ'লো মেয়েরা।

'যাও তোমরা—' আবার তিনি আদেশের স্বরে বললেন।

মিসেস চ্যাটার্জি কিছু হয়তো বলতে চেষ্টা করেছিলেন মেয়েদের পক্ষ নিয়ে—তিনি বলবার অবকাশ না-দিয়ে একরকম জোর ক'রেই বার ক'রে দিলেন মেয়েদের। দুই চোখে কৃতজ্ঞতা ফুটিয়ে সুকৃতি নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে।

'মেয়েরা খেপে গেছে, এখন আপনি কি করবেন।' মিসেস চ্যাটার্জি তাঁর মর্যাদামাফিক কৈফিয়ৎটি আবার তলব করলেন।

একটু সহানুভূতির আভাসেই সুকৃতির চোখ ছলছলে হ'য়ে উঠেছিলো—এই প্রশ্নের জবাব সহসা দিতে পারলো না, একটু পরে মুখ তুলে বললো, 'আপনি কী বলেন?'

'ভবিষ্যৎ ভেবে আপনার কাজ করা উচিত ছিলো', গুরুজনের ভঙ্গিতে রায় দিলেন তিনি।

'আমার তখন কাণ্ডজ্ঞান ছিলো না, মিসেস চ্যাটার্জি'।

'তা বললে তো তারা ছাড়বে না!' অন্য একজন জবাব দিলেন।

চুপ ক'রে রইলো সুকৃতি। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘর আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো, ফাল্গুন মাসের পাগলাটে হাওয়া মাঝে-মাঝে টেবিলের কাপড়, বিছানার চাদর, শাড়ির আঁচল কিংবা ক্যালেণ্ডারের ছবির উপর দিয়ে অজস্রধারে ব'য়ে-ব'য়ে গেলো।

হেডমিস্ট্রেস মিসেস্ পাকড়াশী এসে ঘরে ঢুকলেন। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে একটি দর্শনযোগ্যা চেহারা। সকলে সন্ত্রস্ত হ'য়ে আলো জ্বালালো তাড়াতাড়ি। আবার দরজার ধারে ভিড় জমলো মেয়েদের। উঠলো একটা গুনগুনানির ঢেউ। তিনি ইঙ্গিত করলেন তাদের, তারপর দরজা ভেজিয়ে দিলেন।

বেশি কিছু বলাবলির দরকার হ'লো না, সুকৃতি নিজে থেকেই চ'লে যেতে চাইলো চাকরি ছেড়ে দিয়ে, কেবল অন্য বাসস্থান চিন্তা করবার জন্য সময় ভিক্ষা চাইলো সে।

রাত্রিবেলাই সে-খবর মিসেস চ্যাটার্জি মেয়েদের কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন, কিন্তু শোনামাত্রই তারা ঘোড়ার মতো ঘাড় উঁচিয়ে দাঁড়ালো—'অ্যাপলজাইস করতে হবে আমাদের কাছে। দস্তুরমতো জোড়হাত ক'রে ক্ষমাপ্রার্থনা।' যূথিকার দূর সম্পর্কের এক বোন—সে নাইনের ছাত্রী—গম্ভীরমুখে বললো, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, যূথিকার বাবা বীরভূমের কর্তা। হাকিমি মেজাজের মানুষ, তিনি কি সহজে ছাড়বেন আপনাদের! মা-মরা মেয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন আপনারা—তিনি নিজে এসে মেয়ে রেখে গেছেন আপনাদের কাছে—আমাকেও এই বোর্ডিংয়ে রাখার এই কারণ যে, আমি ওর দেখাশুনো করতে পারবো।'

মিসেস চ্যাটার্জি একটু ঘাবড়ালেন এ-কথায়। কলেক্টর মানুষ—বলা তো যায় না—আর তিনি যখন সুপারিনটেনডেণ্ট, দায়িত্ব অবশ্যই তাঁর—মুখ কাঁচুমাচু ক'রে 'আচ্ছা সে-সব হবে' ব'লে চ'লে গেলেন তিনি—আর মেয়েরা সরোষে গর্জন করতে লাগলো দাঁড়িয়ে, ব'সে, হেলান দিয়ে—নানা ভঙ্গিতে। বোঝা গেলো, সুকৃতিকে তারা নিঃশব্দে চ'লে যেতে দেবে না, তাদের নিষ্ঠুরতা তাকে নিগ্রহের শেষ সীমায় নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু রাত হ'য়ে গিয়েছিলো ব'লে আর বেশিক্ষণ তারা জটলা পাকাতে পারলো না, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুতেই হ'লো আলো নিবিয়ে।

পরদিন সকালবেলা দেখা গেলো, যূথিকা আর গা তুলতে পারছে না বিছানা থেকে। ছুই চোখ জবাফুলের মতো লাল, অস্বাভাবিক শরীরে ব্যথা। যন্ত্রণায় সে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলো। সুকৃতির বন্ধদরজার উপর মেয়েদের সরব এবং নীরব যে-সব রাগ আর বিদ্বেষ বর্ষিত হ'তে লাগলো, তার যদি কোনো অলৌকিক ক্ষমতা থাকতো, তাহ'লে ভিতরের মানুষটির কোনো ঠিকানা থাকতো না এ-সংসারে। মিসেস চ্যাটার্জি সুদ্ধু অভদ্র হ'য়ে উঠলেন এই খবরে। মিসেস পাকড়াশী এসে বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। যূথিকাকে সিক্‌রুমে নেওয়া হ'লো। লম্বা বারান্দা পেরিয়ে শেষপ্রান্তে একেবারে আলাদা এক মস্ত ঘরে, ছোট্টো খাটে একা-একা শুয়ে রইলো সে। মেয়েরা বললো, 'ভাবিসনে যূথিকা, আমরা ফাঁক পেলেই তোর কাছে চ'লে আসবো। আর তোর এই অবস্থা যে করেছে তার প্রতিশোধও নেবো আমরা।'

বেলা বেড়ে গেলো, ডাক্তার আর এলেন না সে-বেলা, মিসেস পাকড়াশী বিড়বিড় করতে-করতে চ'লে গেলেন, মেয়েরা, মাষ্টাররা ইস্কুলের জন্যে তৈরি হ'লো।

বিকেলে ডাক্তার এসে দেখে বললেন, 'বসন্ত। একেবারে আসল বসন্ত!' সংবাদটি রটনা হ'তে দেরি হ'লো না—এবং সঙ্গে-সঙ্গেই সারা বোর্ডিংটি একেবারে থমথমিয়ে উঠলো। ফাল্গুনের প্রথম, দস্তুরমত শীত এখনো— এখনই যে বসন্ত দেখা দেবে কে জানে। তবুও কেন টিকে দেওয়া হয়নি এ-নিয়ে আলোচনা হ'তে লাগলো সকলের মধ্যে—কর্তৃপক্ষের এ-রকম অবহেলা যে কত সাংঘাতিক বিপদ আনে এ-বিষয়ে কোনো মতভেদ রইলো না। মেয়েরা সুকৃতিকে ভুলে গেলো, যে-যূথিকার সমবেদনায় এ-দু'দিন তাদের দুঃখের অবধি ছিলো না তার কথাও মনে রইলো না, একটা আসন্ন বিপদের ভয়ে তারা যেন দিশেহারা হ'য়ে উঠলো। এতগুলো মেয়ে আর মাষ্টারনি এখন কোথায় যায়? এখানে এই একই বাড়িতে যূথিকার সঙ্গে

বসবাস করলে কি কেউই রেহাই পাবে? মিসেস চ্যাটার্জি তো ব'সে পড়লেন হাত-পা ভেঙে—পাকড়াশী সিক্‌রুমের দরজাটি শক্ত-হাতে বন্ধ ক'রে দিলেন। মেট্রন ছুটে গিয়ে শুয়ে পড়লেন নিজের ঘরে—তাঁর মনে বদ্ধ ধারনা হ'লো, আর সবাই যেমন-তেমন, তিনি তো দু'বার গিয়েছিলেন ও-ঘরে—নির্ঘাৎ তাঁর ছোঁয়াচ লেগেছে। প্রত্যেকের মধ্যে একটা দুর্নিবার ভয়ের স্রোত যেন শিরশির করতে লাগলো। মিসেস পাকড়াশী নিজের বিবর্ণ মুখে ঈষৎ রক্তসঞ্চার ক'রে সাহস দিতে চেষ্টা করলেন তাদের। উপায় ছিলো না, কেন না সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, এখন ইচ্ছে করলেই কোথাও চ'লে যাওয়া সম্ভব নয়। মেয়েরা চুপ ক'রে যে-যার জায়গায় গিয়ে ব'সে রইলো—মাষ্টারনিরা চিন্তাকুল হ'য়ে যাবার জায়গা স্থির করতে লাগলো মনে-মনে।

পরের দিন সকাল হ'তেই যে-যার ব্যবস্থায় ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো। নিজেদের-নিজেদের মধ্যে চলতে লাগলো প্রাণ বাঁচানোর গুনগুনানি, জিনিশ-পত্র গোছাবার পরিস্ফুট ব্যস্ততা—বেলা প্রায় ন'টার সময় পাকড়াশী এলেন টিকেদার নিয়ে এবং মিসেস চ্যাটার্জি তাঁকে দেখে এই প্রথম বেরুলেন ঘর থেকে; নিচু গলায় বললেন, 'আমার শরীর খারাপ হয়েছে, আমি আজই চ'লে যেতে চাই।'

'সে কী!' ভ্রূ কুঞ্চিত করে পাকড়াশী তাঁর মুখের দিকে তাকালেন! 'আপনি চ'লে গেলে কী ক'রে হয়?'

'আমাকে যেতেই হবে।'

'বোর্ডিংয়ের কর্তা আপনি—আপনিই যদি—'

'তাই ব'লে তো নিজের জীবন বিপন্ন করতে পারি না, মিসেস পাকড়াশী।'

মিসেস পাকড়াশী তাঁর কথার ধরনে অবাক্ হ'য়ে গেলেন। হেডমিস্ট্রেসের জুতোর শব্দ শুনলেও যে হাত ঘষতে থাকে, তার আজ এই মূর্তি

যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, 'কাজ যখন নিয়েছিলেন তখনি এসব ভাবা উচিত ছিলো।'

'না, এতদূর আমি ভাবতে পারিনি যে, বসন্ত লাগলেও জোর করে আপনারা আটকে রাখবেন। আমি যাবোই।'

'চাকরি—'

'না হয় যাবে—'

'তবে যান, এক্ষুনি বেরিয়ে যান এখান থেকে—' রাগে চোখ-মুখ লাল হ'য়ে উঠলো পাকড়াশীর।

'প্রভাদি—' কাঁচুমাচু-মুখে নতুন মিস্ট্রেস উষা ভট্টাচার্য এগিয়ে এলো গুটি-গুটি।

'কী ? কী চাও তুমি ?' মিসেস পাকড়াশী প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলেন।

'আমি—'

'থামলে কেন ? বলো, যেতে চাই—হ্যাঁ, যাও, সব বেরিয়ে যাও চোখের সামনে থেকে।'

এতক্ষণে দেখা গেলো, দূরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন, মেট্রন-মাসীমা। তাঁর মোটা শরীরে যেন আর বল নেই মনে হ'লো। কাছে এসে মিসেস পাকড়শীর রাগী-মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই নিস্পৃহ-গলায় বললেন, 'আমার ভাইপোর অসুখ, প্রভাদি—আমি আজ দেশে যাবো।'

দাঁতে দাঁতে ঘষলেন প্রভাদি, তারপর মুখ ভেংচিয়ে বললেন, 'ছুটি মঞ্জুর করুন, এই তো ? কিন্তু রোগী দেখবে কে ?'

'সে আমি কী জানি। আত্মজনের চাইতে তো বোর্ডিংয়ের মেয়ে বেশি না!'

চমৎকার যুক্তি। আর এমন নির্ভীক কথাবার্তা—মিসেস পাকড়াশী যেন কথা বলতে পারলেন না রাগে—কটমটিয়ে তাকালেন সকলের দিকে—

তারপর উঁচু হিল ঠকঠকিয়ে চ'লে যেতে-যেতে অস্ফুট গলায় বললেন, 'পুলিশ দিয়ে আট্‌কাবো সব ক'টাকে।'

তেমনি অস্ফুট গলায় পিছন থেকেও উচ্চারিত হ'লো, 'ঈশ্‌!'

বাড়ি গিয়ে মিসেস পাকড়াশী আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে লাগলেন। মেয়েটা তো কাল থেকে একা প'ড়ে আছে। কে জানে কেমন রাত কেটেছিলো—একদিন হয়তো ম'রেই থাকবে। যত সব অনাছিষ্টি। মেয়েটার উপরই তাঁর দারুণ রাগ হ'লো। কী দরকার ছিলো বাপু এই অসুখটি বাধাবার। তিনি তাঁর আঠারো বছরের চাকুরে জীবনে এত বড়ো একটা নচ্ছার মেয়ে আর দেখেননি। কিন্তু মেয়েটা নচ্ছার ব'লে তো আর তিনি ছাড়া পাবেন না, আত্মীয়গুলো তো তাঁকেই ছিঁড়ে খাবে। ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন তিনি।

'আপনার রোগী দেখবেন না?'

'আমি এ-রোগের কী করবো—' উদাসীন হয়ে ডাক্তার বললেন।

'তাহ'লে কি আমি দেখবো?' খিঁচিয়ে উঠলেন পাকড়াশী—'অন্তত একটা নার্স ঠিক ক'রে দিন দয়া ক'রে।'

'এই মফস্বলে কি নার্স পাওয়া সহজ হবে?'

'ওদিকে ত সব পালাচ্ছে—মিসেস চ্যাটার্জি, মেট্রন, মেয়েরা—কী মুশকিল বলুন তো!'

'তাই তো।'

'কিন্তু আমার তো আর পালাবার উপায় নেই। এই তো দেখুন, কাল কত রাত পর্যন্ত দেখাশুনো করতে হ'লো, আজ এই এত বেলা ওখানেই কাটালুম—অস্পৃশ্যই হোক, যা-ই হোক—আমি তো ফেলতে পারি না। তারপর একটা ভালো-মন্দ হ'লে তো আমাকেই—'

'সেই তো।'

'আপনারা ত সব দেখছেন, আমি কী রকম আপ্রাণ করছি, বলবেন সে-কথা গার্জেনদের—'

'নিশ্চয়ই !'

'আচ্ছা।'

'আচ্ছা—' ডাক্তার উঠে গেলেন। আর মিসেস পাকড়াশী আবার আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে লাগলেন।

বেলা এগারোটার মধ্যে খালি হ'য়ে গেলো সারা বোর্ডিং। খানিক সময় ঝি-চাকরদের চলাফেরা আর কর্কশ গলার একটা আভাস মাত্র, তারপরেই একেবারে নিথর নিঝুম। দুপুরের একটা খাঁ-খাঁ আর ছমছমে ভাব নামলো সারা বাড়িটার উপর। আর সেই বাড়ির প্রকাণ্ড সিক্‌রুমের একপ্রান্তে একটি অপরিসর খাটে ধুঁকতে লাগলো যূথিকা। যেই থেকে তার ব্যায়রামটি ঘোষণা হ'য়েছে, সেই থেকে একলা ঠিক এইরকম ক'রেই প'ড়ে আছে সে। রাতটা কেমন কেটেছিলো তার কোন স্মৃতিই মনে আনতে পারলো না। আরক্ত চোখ মেলে ঘরের চারদিকে ব্যাকুলভাবে কী যেন খুঁজলো, অস্ফুট শব্দ ক'রে একবার মাকে ডাকলো, তারপর চোখ বুজে ছটফট করতে লাগলো অস্থির হ'য়ে। সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, ব্যথায় ফেটে গেলো, জ্ব'লে গেলো, পুড়ে গেলো। জল কই? আবার চোখ খুললো সে…উত্তপ্ত হাতটি মেলে ধরলো কিসের প্রত্যাশায়…ব্যর্থ হ'য়ে উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগলো। জল, জল চাই…প্রাণপণ চেষ্টায় সমস্ত ইচ্ছা-শক্তিকে সে চালিয়ে নিয়ে গেলো ঘরের কোণের জলভরা কুঁজোটার দিকে, কিন্তু শরীর গেলো না, কেবল খাট থেকে আদ্ধেক পর্যন্ত একটা অংশ ঝুলে পড়লো মাটির দিকে।

হয়তো একটু সময় অচৈতন্য হ'য়ে পড়েছিলো সে, কিংবা তৃষ্ণার বুকফাটা আবেদনে মুহ্যমান হ'য়ে গিয়েছিলো—সহসা তার জ্বরতপ্ত বসন্তভরা দেহে যেন কার শীতল স্পর্শ লাগলো, চোখ মেলে সে তাকালো তার দিকে, তারপর তাকিয়েই রইলো, চোখ আর ফেরাতে পারলো না। দুটি স্নেহ-

ভরা হাতে সুকৃতি তাকে আস্তে শুইয়ে দিলো বালিশের উপর—ঝুঁকে প'ড়ে বললো, 'বড়ো কষ্ট ?'

যূথিকা জবাব দিলো না, শুধু দুইচোখ-ভরা জল নিয়ে অস্ফুটে উচ্চারণ করলো, 'মা !'



ভাই-বোন

তুলতুলের যেদিন চার বছর পূর্ণ হ'লো ঠিক তার পর দিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠেই দেখলো তার একটা ছোট ভাই হয়েছে। মার পাশে—বুকের কাছটিতে যেখানটায় রোজ সে নিজে ঘুমোয় সেখানটায় শুয়ে-শুয়ে ঘুমুচ্ছে আরাম ক'রে—একটা লাল টুকটুকে ডলপুতুলের মতো। বাবা তাকে কোলে ক'রে এসে দাঁড়ালেন সেখানে, মার বিছানা থেকে একটু দূরে—গালে চুমু খেয়ে বললেন, দেখছো, কেমন সুন্দর ভাই হয়েছে তোমার—তোমার ভাই—এক্কেবারে একা তোমার।' খুশিতে আলো হ'য়ে উঠলো তুলতুলের ফোলা-ফোলা মুখ—তার চার বছরের ছোট্ট জীবনে এমন সুখের ঘটনা আর কি ঘটেছে কখনো? এমন সুন্দর জীবন্ত-পুতুল নিয়ে কি খেলতে পেরেছে? ছেঁচড়ে-মেচড়ে সে নেমে গেলো বাবার কোল থেকে—তারপর একছুটে বিছানার কাছে। যে চেঁচিয়ে বারণ করলো, এতক্ষণে তুলতুলের নজর পড়লো তার দিকে—সে আঁতুড়-ঘরের দাই। কালো, মোটা, বিচ্ছিরি—ডাইনি না তো? ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়ালো তুলতুল, তারপরেই ঠোঁট কাঁপিয়ে—ভ্যাঁ।

দুর্বল মা শুয়ে আছেন চুপ ক'রে—হাত বাড়িয়ে বললেন, 'ও মা, কাঁদে নাকি? তোমার একটা ভাই হয়েছে না ছোট্ট—সে শুনলে বলবে কী? ছি-ছি—এই দেখ কী রেখেছি তোমার জন্য।' নিজের জন্য রাখা বিস্কুটের টিনটা তিনি টেবিলের উপর থেকে তুলে ঠেলে দিলেন তুলতুলের দিকে, স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওকে নিয়ে যাও এখান থেকে—বিস্কুট-টিস্কুট দিয়ে যদি ভুলিয়ে রাখতে পারো। বাতাসিকে ডাকো না—মুখটুখ ধুইয়ে দুধ খাইয়ে দিক।'

ডাকতে হ'লো না, বাতাসি নিজেই এসে মুখ বাড়ালো ঘরে, 'এসো, মুখ ধুইয়ে দি—এখন আর অত মার কাছে আহ্লাদ না—মা এখন ভাইয়ের—'

তুলতুল তার চকচকে কালো চোখ তুলে ধরলো মার মুখের উপর। মা অস্থির হ'য়ে উঠলেন—'এ সমস্ত কী যা-তা বলছিস—কক্ষনো ওকে ও-রকম বলবি না ব'লে দিলুম—যাও তো বাবা—আমার লক্ষ্মী সোনা, মুখ ধুয়ে, দুধ খেয়ে এসো—আমার অসুখ করেছে কিনা, তাই ডাক্তার কাউকে বিছানায় আসতে বারণ ক'রে দিয়েছেন—'.

'ভাই আছে কেন?' ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদো-কাঁদো গলায় বললো তুলতুল।

বাবা বললেন, 'ভাইটা তো বিচ্ছিরি, হাঁটতে পারে না, কথা বলতে পারে না, কেবল-কেবল শুয়ে থাকে—তুমি কী সুন্দর দুধ খেতে জানো, কথা বলতে জানো—'

একটু-একটু খুশি হ'লো তুলতুল—তারপর আরো দু'একবার খোশামোদের পর বাতাসির কোলে চ'ড়ে, মুখ ধুয়ে দুধ খেতে গেলো। দিনের বেলা একরকম মন্দ কাটলো না, কিন্তু রাত্তিরে ভারি গোলমাল আরম্ভ করলো তুলতুল—কিছুতেই সে মার কাছ ছাড়া ঘুমুবে না—মার হাতে ছাড়া খাবে না—সে এক মহা ব্যাপার। অবশেষে মা কাছে নিলেন তাকে—বাচ্চাটাকে দায়ের কোলে দিয়ে শোয়ালেন নিজের কাছে। পাশের ঘর থেকে, এই উপলক্ষ্যে-আসা বুড়ি-মামীশাশুড়ী ক্যাট ক্যাট করতে লাগলেন, কিন্তু তুলতুলের বাবা বললেন, 'হ্যাঃ—অত সব নিয়ম-কানুন নাকি চলে কখনো—কাল থেকে তুলতুল ওর মার সঙ্গেই খাবে-টাবে ঘুমুবে।' এই ব'লে হাঁপ ছেড়ে তিনি নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। আর এদিকে মা দুর্বল শরীর নিয়ে চাপড়াতে লাগলেন মেয়েকে, প্রতিদিনের মতো গুনগুনানি সুর ধরলেন ঘুম-পাড়ানি গানের। তাঁর যেন কেমন কষ্ট হ'তে লাগলো এই চার বছরের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞীটির জন্য—মনে হ'লো তিনি নিজেই তাকে আজ নামিয়ে দিলেন সিংহাসন থেকে—আর ঐ খুদে মানুষটা, যে মাত্র আঠারো ঘণ্টা আগে এসে জুড়ে

বসেছে তাঁর কোলে, সে-ই যেন সর্বেসর্বা হ'য়ে উঠলো হঠাৎ। আর ঘুমিয়ে পড়তে-পড়তে তুলতুলের ছোট বুকেও কোথায় জানি একটা ব্যথা লেগে রইলো, যার কোন কারণ সে জানে না, বোঝে না—বোবা অন্ধ একরত্তি বেদনাবোধ।

তারপরে তিন-চার মাস কেটে গেলো আর বাচ্চাটার এই গোপ্তা-গোপ্তা গোল-গাল হাত-পা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে কী খেলার ধুম! হাসতে গেলে যখন মোটা-গালের ভাঁজে চোখ দুটি ডুবে যায়—তখন সকলে হেসে ওঠে একসঙ্গে। বাড়ির সক্কলের সব মনোযোগ সেই বাচ্চার দিকে। মার তো সময়ই নেই, রাত-দিন তিনি ব্যস্ত খোকাকে নিয়ে, এই দুধ খাওয়াচ্ছেন, এই বোতল ভেজাচ্ছেন জলে—স্নান করাচ্ছেন সময়মতো—তার কাজলটি, পাউডারটি, কমলা-লেবুর রসটি—এত-কিছুর ফাঁকে-ফাঁকে তিনি একসময়ে টেনে নেন তুলতুলকে।—'আয়, শিগগির আয়।'

'ন্-না।'

'না কী রে, বেলা হ'লো কত—স্নান ক'রে খেতে হবে না?

'আমি খাবো না।'

'না, খাবো না! অমনিই তো প্যাঁকাটি হচ্ছেন দিন-দিন—আবার, খাবো না!'

খপ ক'রে এক টানে তাকে কাছে আনেন, পটপট ক'রে জামার বোতাম খুলে দেন, খসরখসর ক'রে এক থাবড়া তেল মাখিয়ে দেন মাথায়—বলেন, 'এত দিক করিস কেন রে সারাদিন? একটু লক্ষ্মী হ'য়ে থাকতে পারিস না?' ড্রামভর্তি জল থেকে ঘটি দিয়ে তুলে গবগব ক'রে কত তাড়াতাড়ি যে তার স্নান সেরে গা মুছে দেন তার ঠিক নেই।

তুলতুলের মন ব্যথায় ভ'রে ওঠে—মার হাত কী সুন্দর নরম ছিলো আগে, আস্তে টেনে তিনি বুকের কাছটিতে নিয়ে বলতেন, 'স্নান করবে না সোনামণি'—তুলতুল এখনকার মতো তখনো ছিটকে স'রে যেতো—

মা আবার কোলে তুলে নিতেন—চুমু খেতেন—সে যত আপত্তি করতো—মা তত আদর করতেন, তারপর নরম হাতে তেল মাখাতেন, খেলার মতো ক'রে সাবান দিয়ে দিতেন গায়ে, গান গেয়ে-গেয়ে জল ঢেলে দিতেন মাথায়—স্নান হ'তো তার একটা খেলা।—আর, এখন? এখন মার সময় নেই—এখন দশটা বাজতেই মা চকিত হ'য়ে আর তাকে স্নান করান না, করান ভাইকে—নেংটো ক'রে কতক্ষণ যে বুলিয়ে-বুলিয়ে তেল মাখান আর তেল মাখাতে-মাখাতে ঐ ফোলা আর লালাভরা মুখে নিচু হ'য়ে হ'য়ে কত যে চুমু খান—তুলতুল চেয়ে-চেয়ে দেখে, মার মুখের অত চুমু থেকে একটি চুমুর জন্য মন তার আকুল হ'য়ে ওঠে—মা তা লক্ষ্যও করেন না। ছোট্ট সিল্কের টুকরো দিয়ে আস্তে আস্তে দামি সাবান ঘ'ষে দেন ভাইয়ের গায়ে—শাদা গামলায় তার ছোট্ট শরীর ডুবিয়ে দিয়ে কী আদর, তারপর ওঠাতে গেলে যতবার কাঁদবে ততবার মা ডোবাবেন তাকে—তারপর যখন তুলবেন, কোলে নিয়ে কত নরম ক'রে গা মোছাবেন—পাউডারের ঘন প্রলেপে শাদা ক'রে দেবেন শরীর, তারপর কাজল পরিয়ে—ঐ তু'গাছা পাৎলা চুলে লাল চিরুনি একঘণ্টা বুলিয়ে, খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে, তবে মনে পড়বে তুলতুলের কথা।

স্মৃতির কাঁটা খচখচ করতে থাকে তুলতুলের বুকের মধ্যে। মার এই মনোযোগ, এই আদরের ভাষায় রাতদিন আবোল-তাবোল কথা, ঠিক এমন ক'রেই বুকের মধ্যে নিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়ানো—সেই সব কথা মনে পড়ে তার—আবছা-আবছা বোঝা-না-বোঝার মাঝখানে একটা মন-কেমন-করা ব্যাকুলতা পাগল করে তাকে—মার এই বিরক্তি, এই তাড়াহুড়ো, এইটুকুতেই ধমক—কেমন যে একটা বুকচাপা কষ্ট দেয় কাউকে বোঝাতে পারে না, নিজেও যেন বোঝে না ঠিক। তাই একটুতেই আজকাল কান্না পায় তার, এতটুকু ত্রুটিতেই এতখানি রাগ হয়—মাকে দেখলেই বুক ঠেলে যেন কী-একটা তুঃখে মন ভ'রে যায়। মার হাতে আর কিচ্ছু করতে ইচ্ছে

করে না—কিন্তু তার এই অভিমান, এই বেদনা মা বোঝেন না—তার কান্নাটাই দেখেন, দাপাদাপিটাই দেখেন। এই সতেরো রকম ঝামেলা সেরে মেয়ের এই জেদ, অন্যায় অসভ্যতা বরদাস্ত করতে পারেন না তিনি—আশ্চর্য, যে-মা একদিন একটা ধমক পর্যন্ত দেননি, সেই মা-ই কেমন অকাতরে পটাপট চড় কসিয়ে দেন গালে !

আগে ঘুম ভেঙে উঠেই সে মাকে পেতো মার কোলে চ'ড়েই সমস্ত সকাল কাটতো তার—চোখ খুলতেই হাসিমুখে হাত দু'টি মা বাড়িয়ে দিতেন তার দিকে, বলতেন, 'ফুটলো ? আমার কমল কি ফুটলো এতক্ষণে ?' কোলে নিয়ে আদর করতেন—তবু একটু কেঁদে নিতো সে, আর মা চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে-ছিটিয়ে তাকে হাসাবার চেষ্টা করতেন—'এট্টুখানি নামো তো বাবু !' কিছুতেই নামতো না তুলতুল—আর তুলতুলকে কোলে নিয়েই ছুটে-ছুটে মা দুধ গরম ক'রে আনতেন—কোলে বসিয়ে টোস্টে মাখন মাখিয়ে দিতে-দিতে গল্প করতে ছোট চামচে দিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ডিম খাইয়ে দিতেন—সব কথাই মনে আছে তুলতুলের। আর, এখন ? 'ওঠ, ওঠ, শিগগির ওঠ—ঈশ, কী বেলাতেই উঠতে পারে মেয়ে !'—মার কথার সুর শুনলেই সমস্ত চিত্ত জ্বলে যায়, তক্ষুনি চীৎকার করে ওঠে সে—'না, উঠবো না তো—উঠবো না, উঠবো না, কিছুতেই উঠবো না।'

'ঘুম থেকে চোখ মেলেই আরম্ভ করলে ?' মার গম্ভীর গলা। 'হ্যাঁ, করবো তো, বেশ করবো !' তুলতুল হাত দিয়ে-দিয়ে ঠেলে দেয় মাকে, বালিশ তচনচ করে আর হাত-পা ছোঁড়ে, মাকে কী কষ্ট দিতে পারে, কতখানি কষ্ট তার চিন্তায় অধীর হ'য়ে ওঠে।

বেচারা মা ! সারারাত হয়তো ঘুমোতেই পারেননি তিনি বাচ্চার যন্ত্রণায়, সকাল না-হ'তেই তো আবার উঠতে হয়েছে—কী করবেন—ছেলেটা তো একেবারে পাখীর সঙ্গে জাগে—আর জেগেই তার ক্রিয়াকলাপ—

কখনও যদি একটু অসাবধান হ'য়ে পড়েন তাহ'লেই তো একেবারে কাঁথা-বালিশ, এমনকি, নিজের মুখ-মাথাও চন্দনে মাখামাখি। পরিষ্কার-টরিষ্কার করতে-করতেই ছেলের চ্যাঁচানি খিদের তাড়নায়—জামা পরিয়ে, খাইয়ে, মুখ মুছিয়ে তবে ত অন্য কাজ? স্বামীর আপিশ ন'টার সময়, তাড়াতাড়ি তিনি ছুটলেন চায়ের যোগাড়ে, চায়ের পাট তুলে তাড়াতাড়ি চাকরকে বাজারে পাঠানো—ঝি-টি তো নবাবনন্দিনী—একবার যাচ্ছেন, আর-একবার আসছেন—কখন তার শরীর ভাল থাকবে আর খারাপ হবে তার ঠিক কী—অতএব ঘরদোর ঝাঁটপাটের ব্যবস্থা করতে হয়, বিছানা বালিশ রোদে দিতে হয়;—আসে বাজার, ছোটেন রান্নাঘরে—ইতিমধ্যে হয়তো পুত্ররত্নের মর্মভেদী চীৎকারে পাড়া পাগল। এত সবের মধ্যে চার-বছর-পূর্ণ পাঁচ-বছরের বুড়ো মেয়েও যদি এটুকু ছেলের সঙ্গে কান্নার প্রতিযোগিতা করে তো রাগ ধরে না? একবার দু'বারের পরেই তিনি ধৈর্য হারান, তুলতুলের কোমল গাল তাঁর হাতের স্পর্শে লাল হ'য়ে ওঠে।

আস্তে-আস্তে নিরুপায় তুলতুল বাবার দিকেই ঝুঁকে পড়লো শেষে। মার ব্যবহার, মার এমন অকারণ নিষ্ঠুরতা তার ছোট্ট হৃদয়কে যেন ভেঙ্গে-চুরে দিলো; অগত্যা বাবাকেই আশ্রয় করলো সে। বাবাও আনন্দে তাকে গ্রহণ করলেন। সুন্দর-সুন্দর ঝাঁকড়া চুল, ফরসা রং, বুদ্ধি হয়েছে, মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে, বাবারা তো এইরকম তৈরী ছেলেমেয়েই পছন্দ করেন। পাঁচমাসের মোটাসোটা বাচ্চাটাকে ভালো লাগে খুব, কিন্তু এখনো তো একতাল মাংস ছাড়া আর কিছু নয়? অতএব সেই একতাল মাংসকে লালন ক'রে মা মানুষ বানাতে লাগলেন একাগ্র হ'য়ে—আর মনুষ্যপদবাচ্য তুলতুলের সঙ্গে তার বাবার সম্পর্ক নিবিড় হ'য়ে উঠলো ক্রমে। মার পাশে শোওয়ার অভ্যেস ছেড়ে এবার তার ছোট্ট বালিশ পড়লো তার বাবার পাশে। কী লাভ মার পাশে শুয়ে? মা কি আর জড়িয়ে ধরেন



তাকে বুকের মধ্যে? চাঁদের গল্প বলেন? ঘুম পাড়ান গান গেয়ে? ওপাশে কেবল ঘুরে-ঘুরে শোন ভাইয়ের দিকে, যদি সে টানাটানি করে·বেশি তক্ষুনি বলেন, 'বাবা রে বাবা, শান্তিমতো একটু শুতেও দিবি না তুই?' তারপর ফেরেন বটে—কিন্তু সেই ফেরায় কতটুকু মন দেন যে তুলতুলের মন ভরবে? বাবাই ভালো—কত সুন্দর মিষ্টি কথা বাবার, কত ভালো-ভালো গল্প জানেন—কেমন সুন্দর তার দিকেই ফিরে থাকেন সারাক্ষণ



ভাইয়ের হাত-পা নাড়া দেখতে দেখতে······

—তার নরম-গালে টোকা দেন—চুমু দেন—তুলতুলকে বলতেও হয় না সেজন্য। বাবার কালো-কালো ঘন চুলের মধ্যে সেও তার ছোট আর লালচে আঙ্গুল ডুবিয়ে আদর করে—গলা জড়িয়ে ধরে—মার অভাবের ফাঁকা-বুকটা ভ'রে নিতে চায় বাবার ভালোবাসায়।

এতক্ষণে তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছো—তুলতুলটা কী রে? ভাইকে হিংসে করে!—তা কিন্তু ঠিক কথা না। ভাইকে খুব ভালবাসে সে,

ভাইয়ের হাত-পা নাড়া দেখতে দেখতে, একগাদা থুতু ছিটানো বুড়বুড় ক'রে ভাষাহীন কথার আওয়াজ শুনতে শুনতে আহ্লাদে গ'লে যায়। আর আজকাল এমন হাসতে শিখেছে, আর দুষ্টুও কি কম নাকি—এর মধ্যেই কি সুন্দর দিদি বলে, পষ্ট শুনতে পায় তুলতুল। দ্দদ্দ, দ্দদ্দ—দিদ্দি দিদ্দি, এ আর কে না বোঝে যে তুলতুলকেই ডাকছে সে। মুখ তার গম্ভীর হ'য়ে ওঠে, চোখের পাতা দস্তুরমতো ভারি হ'য়ে যায়—গলার সুরটা ঠিক মার মতো ক'রে বলে, 'কী রে বল না ডাকিস কেন?' কিংবা, ছি বাবুন, দিদিকে কি এমন ক'রে দিনরাত বিরক্ত করতে হয়—দেখছো না আমি কাজ করছি এখন?'

বাবার সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে, ভাইকে অসম্ভব ভালোবেসে—মায়ের অনাদরটা যখন প্রায় সহ্য হ'য়ে এলো—ততদিনে তুলতুলের ভাই বাবুইও বেশ মানুষের মতো হ'য়ে উঠলো। নিচে উপরে তার পাঁচটা চকচকে শাদা দাঁত উঠেছে, আর সেই দাঁতে কী জোর! নতুন খাটটা কামড়ে-কামড়ে এতখানি খেয়ে ফেলেছে সে। খাটো জাঙিয়া প'রে, হাতকাটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে ধ'রে-ধ'রে বেশ এক-পা দু'পা হাঁটে এখন, মা বলতে পারে, বাব্‌বা বলে—আর দিদি তকবেই শিখেছে। দিনরাত সে হামি করছে সকলকে, যে যত দূরেই থাক না কেন, মা যদি বলেন 'বাবুন, এত্‌তু হামি ক'রে দাও তো'—আর কথা নেই ঐখান



……ঠোঁট গোল ক'রে বমি ক'রে দেবে

থেকেই সে ঠোঁট গোল ক'রে হামি ক'রে দেবে। তুলতুলকে বলে 'তুতুন্'—বাড়ির চাকর গোবিন্দকে বলে, 'গনন্' আর যেই বাবা আপিশ থেকে আসবেন, দু'হাত বাড়িয়ে ঝুঁকতে থাকবে কাছে যাবার জন্যে—'নেন্নে নেন্নে'—আগে-আগে নিতেন না বাবা। মেয়েই তাঁর প্রথম, মেয়েই তাঁর প্রধান—সেখানে কি আর কেউ? মেয়ে নিয়েই তাঁর যত আদর। অমন মেয়ে কি সারা পৃথিবীতে আর জন্মেছে নাকি? এত সুন্দর আর কার চুল? কার চোখ? এত বুদ্ধি কার?

আপিশ থেকে বাবা কখন ফিরবেন এই আশায় বেলা পড়তেই তুলতুল দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার ধারের বারান্দার শিকের ফাঁকে চোখ রেখে, কিন্তু বাবুই একটু বড়ো হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বাবার সেই একাগ্রতায়ও যেন চিড় খেলো একটু! ভাইকে বাবা কোলে নেবেন, আদর করবেন, তা নিয়ে তো তুলতুলের অভিযোগ নেই—অথচ অভিযোগটা যে কী তাও জানে না স্পষ্ট ক'রে। যেমন মা একদিন ভাইকে পেয়ে ভুলে গিয়েছিলো তাকে, সে অনুভব করলো, বাবাও যেন ঠিক তেমনি হ'য়ে যেতে লাগলেন আস্তে-আস্তে। আবার বুক ভারি হ'য়ে উঠলো তার, মন ভার। এখন বাবা তার বুদ্ধি দেখে অবাক্ হন না, তার কোনো কথা, কোন কাজই আর বাবাকে হতবাক ক'রে দেয় না আগের মতো, আর ভাই যে একটু সামান্য পা ফেলে হাঁটে, কাজের জিনিশ চিবিয়ে নষ্ট ক'রে রাখে, চুরি ক'রে বারে-বারে লজেন্সের শিশির কাছে যায়, তাই নিয়ে কি অবাক হবার ধুম! আশ্চর্য! ভাই যখন কথা কপচায়, বাবা বলেন, 'দেখ, দেখ, এখুনি কেমন কথা বলবার চেষ্টা!' ভাই যখন বাবার কাজের বই ছিঁড়ে দিয়ে পালিয়ে আসে তখন বলেন, 'ও মা, কি দুষ্টুরে? কেমন বুদ্ধি ক'রে আবার পালিয়ে যাচ্ছে!' সেদিন কেমন হামা দিয়ে গিয়ে ভাঁড়ার ঘরে আম চুরি ক'রে খাচ্ছিলো—নাকে মুখে পেটে—কী একখানা রূপ খুলেছিলো সব গায়ে আমের রস লাগিয়ে—যেই মাকে দেখতে পেলো, অমনি হাত বাড়িয়ে কুটিকুটি পাঁচখানি

দাঁত বের ক'রে একগাল হাসি—'নেন্‌নে—কাক্‌কা—মা—কা!' 'দুষ্টু, এই করছো চুপে-চুপে ব'সে! আবার আমাকে আম সাধা হচ্ছে, কা—কা—তোর মতো পেটুক নাকি রে আমি যে খাবো!'—ছুটে গিয়ে সেই রসমাখা বাবুইটাকে কোলে নিয়ে মার কী চুমু—'ছাখো, শোনো'—বাবার কাছে এসে বাড়িয়ে-বাড়িয়ে আরো যে কত-কিছু বুদ্ধির কথা মা জানালেন হাসতে-হাসতে তার ঠিক নেই—তুলতুলের সেদিন রাগে একটা চড় মারতে ইচ্ছা হয়েছিলো ভাইকে! ভারি একটা করেছে, তার আবার বাহাদুরি কত! ও-রকম জামা নষ্ট ক'রে তুলতুল আম খাক তো—আগুন হ'য়ে যাবেন না মা—'আবার জামা নোংরা করেছো, ভালো ক'রে খেতে পারো না?' না, পারি না, নোংরা করবো তো, একশোবার করবো, বেশ করবো! মা-বাবারা কেমন ক'রে এতো খারাপ হ'য়ে যায়—কেন এমন একচোখো হন—দরজার কোণে ব'সে-ব'সে ছলোছলো-চোখে অনেক্ষণ সে-কথা ভেবেছে তুলতুল!

আগে সকালবেলা ঘুম ভেঙে উঠতেই সে বাবার গলা জড়িয়ে ধরতো—বাবা ফিরে চেয়ে আদর করতেন তাকে—এখন ভোর না-হ'তেই বাবুইটা এসে হাজির হবে বিছানায়—ঐটুকু খাটে তিনটে লোক ধরে নাকি? তুলতুল যে আপত্তি করে তা কি এতই অন্যায় যে, অমনি মা বলে উঠবেন, 'আচ্ছা, তুলতুল—অতটুকু ভাইটাকে তোর এত হিংসে কেন রে?' আর মার কথা শুনলেই রাগে অস্থির হ'য়ে যায় তুলতুল—'হ্যাঁ—বেশ করবো, হিংসে করবো!' তক্ষুনি সে এক ধাক্কায় বাবার বুকের উপর থেকে ফেলে দেয় ভাইকে। বাবা আদর ক'রে তাকে তুলে নেন, তারপর গম্ভীর গলায় বলেন, 'ছি, তুলতুল!' ঐটুকু বলাই যথেষ্ট—তুলতুলের বুক ভেঙে যায়।

আপিশ থেকে বাবা কখন ফিরবেন এই আশায় যখন আগে-আগে ব'সে থাকতো তুলতুল, বাবা এসেই জামা জুতো না ছেড়েই কোলে নিতেন তাকে—ছোট-ছোট মুঠি ভ'রে দিতেন বিস্কুট আর লজেন্স। বাবুইটা এত পাজি, ঠিক সময়মতো সে-ও আজকাল বেশ বাবার আশায় ঘুরঘুর করতে

শিখেছে সিঁড়ির মুখে—তুলতুল যতই তাকে ঠেলে দেয়, ততই সে হাসে আর বলে 'বাবা আব্বে, বাবা বা-ও বাবা বিকু দেয়', আর যেই বাবার জুতোর আওয়াজ পাবে, একেবারে যেন ময়ূরের মতো আনন্দে নাচতে থাকবে—আর দেখলে কি কথা আছে—ঝাঁপিয়ে পড়বে কোলে—সাধ্য কী, তার আগেই তুলতুল দেখা করে বাবার সঙ্গে। ছোট-ছোট মোটা-মোটা হাত দিয়ে গলা জড়াবে—মুখে একগাদা থুতু মাখিয়ে আদর করবে—আর বাবাও তক্ষুনি গ'লে যাবেন ছেলের আদরে—আর, এদিকে তুলতুল যে কত ভদ্র, কত সভ্য হ'য়ে, কত আশা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে আর খেয়ালই নেই! একদিন টিঁকতে না-পেরে সে-ও ভাইয়ের মতো ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো বাবার গায়ের উপর। ভাইকে নিয়ে প'ড়ে যেতে-যেতে কোনরকমে টাল সামলে নিলেন তিনি, তারপর রাগ ক'রে বললেন, 'কী যে অসভ্য হচ্ছো তুমি দিন-দিন, প'ড়ে যেতাম যদি? এত বড়ো হয়েছো—বোঝো না?' বড়ো, বড়ো, বড়ো, কত বড়ো হয়েছে সে? কবে বড়ো হয়েছে? নিজেরা এখন দেখতে পারে না কিনা, তাই সবটাতেই দোষ, আর ভাইয়ের সব ভালো। দুঃখে ক্ষোভে ফেটে গেলো তুলতুল। তখন তো কাঁদলোই—অযথা আবদার ক'রে সারাটা সন্ধ্যাও সে কাঁদলো, আর সারাটা সন্ধ্যা তেমনি বকুনিও খেলো—তারপর ঘুমিয়ে পড়লো না-খেয়ে।

শেষে হ'তে-হ'তে এমন হ'লো যে দিনে-রাতে এমন একটি মুহূর্ত যায় না যখন কোনো-না-কোনো একটা যন্ত্রণা লেগেই আছে তুলতুলকে নিয়ে—অস্থির অধীর দাপাদাপির একটা ছোট্ট যন্ত্রই যেন হ'য়ে গেল সে। ভালো দাও, মন্দ দাও, সব কিছু সে মিলিয়ে দেখবে ভাইয়ের সঙ্গে, দুটো যদি জামা আনলো দু'জনের জন্য—আর তার নিজেরটা যদি হাজারও দামী হয়, সুন্দর হয়, তবুও ভাইয়ের জামাটা একশোবার খুঁটে-খুঁটে দেখবে আর বলবে, এটাই বেশি সুন্দর, এটাই ভালো। উপায় নেই। ছোট ব'লে যে

বাবুইকে একটা খেলনা কিনে দেবে, একটা খাবার এনে দেবে, তাহ'লে তো বাড়ি একেবারে তোলপাড়। মা-বাবা গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন মেয়ের কথা। মারো, কাটো, শাসন করো, আদর করো—কিছুতেই আর শোধরাবার নয় সে। ঘুম থেকে উঠে আরম্ভ হ'লো বায়না, আর শেষ হ'লো রাত দশটায় যতক্ষণ না ঘুমে ঢুলে পড়লো।

তার ছোটো মনে এ-ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে গেলো যে, তাকে কেউ ভালোবাসে না, কেউ দেখতে পারে না। তার নিজের কিছুই দোষ নেই—খামকাই সকলে মিলে তাকে বকে, মারে। সে রোগা হ'য়ে গেলো, বিচ্ছিরি হ'য়ে গেলো, কাঁদতে-কাঁদতে গলার আওয়াজ এমন বদস্থর হ'লো যে, তার নিজের কানেই বেস্থরো লাগতে লাগলো। ভালো হবার চেষ্টা যে সে করে না তা নয়, কিন্তু এমন ভালোবাসাহীন বাড়িতে কি মানুষ ভালো থাকতে পারে ?

শেষে এই মনের কষ্টে-কষ্টে অসুখ করলো তার। প্রথম দিন গা গরম-গরম হ'লো একটু, দ্বিতীয় দিন একটু বেশি, আর তৃতীয় দিন একেবারে বেহুঁশ। মা উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে মেয়েকে কোলে নিয়ে ব'সে রইলেন সারাদিন, বাবা আপিশ কামাই করলেন, আর বাবুই কোথায়-কোথায় কেঁদে-কেঁদে ঘুয়ে বেড়াতে লাগলো সারাদিন ঝিয়ের কাছে। তুলতুল জ্বরে-ভরা শরীর নিয়ে নির্জীবের মতো প'ড়ে রইলো চোখ বুজে। কিন্তু তার জ্ঞান ছিলো,—মার এই নিবিড় সান্নিধ্য এত কষ্টের মধ্যেও যেন অনেক শান্তি দিলো তাকে। সাতদিন একই ভাবে রইলো তার জ্বর, আর সাতদিনের মধ্যে মার নাওয়া-খাওয়া-ঘুম—ভাইকে কোলে নেওয়া—কিছুই আর রইলো না একমাত্র তুলতুল ছাড়া। দিন-রাত ঝুঁকে আছেন তিনি মুখের উপর, ঝাপটে তুলে নিচ্ছেন তাঁর সুন্দর গন্ধ-ভরা বুকের মধ্যে। 'তুলতুল' আমার সোনা, আমার বাবা, আমার মণিটা'—গলার স্বর যেন ঠাণ্ডা মিষ্টি হাওয়ার মতো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে তুলতুলের যন্ত্রণাকাতর রুগ্ন দেহকে।

আর, বাবা? পিছনে হাত দিয়ে পাইচারি করছেন তিনি সারারাত—এক-একবার দাঁড়াচ্ছেন এসে মাথার কাছে—একবার ছুটছেন ডাক্তারের বাড়ি, আবার যাচ্ছেন ওষুধ আনতে—কখনো একেবারে কাছে এসে ভারি-গলায় ডাকছেন, 'আমার মা-মণি—আমার সোনা।'

মা-বাবার ব্যবহার দেখে তুলতুল একেবারে অবাক্। তবে কি তাঁরা এখনো ভালোবাসেন তাকে? কই, তুলতুল তো কক্ষনো বোঝেনি আগে এ-কথা! তবে কি এতদিন তারই ভুল ছিলো? দোষ কি তবে তারই? জ্বরে হুটি আরক্ত চোখ মেলে বারে-বারে সে তাকাতে লাগলো তাঁদের মুখের দিকে। ছোটো মানুষ, ভালো ক'রে ভাবতে পারলো না সব কথা, কেমন যেন কান্না পেলো তার। শরীরের অত কষ্টের মধ্যেও একটা স্নিগ্ধ আনন্দে মন ভ'রে গেলো।

ডাক্তার এসে বললেন, 'আশ্চর্য, কাল থেকে আজ যে অনেক ভালো—প্রায় তুলনাই হয় না!'

মা-বাবার মুখে এই ক-দিনের মধ্যে এই প্রথম হাসি ফুটলো ডাক্তারের কথা শুনে। এই প্রথম মা তার বিছানা থেকে উঠে গিয়ে ভালো ক'রে মুখটুক ধুয়ে এলেন। বাবা সেদিন আপিশে গেলেন অনেক শান্ত-মনে।

আর, তুলতুল? তুলতুল সারাদিন একটুও বিরক্ত করলো না মাকে, ওষুধ খেতে কষ্ট হ'লো; তবু খেয়ে নিলো নিঃশব্দে—মা-র খাবার সময় আঁচল চেপে বসিয়ে রাখলো না জেদ ক'রে—আর রাত্রিবেলা চোখ বুজে ঘুমুবার চেষ্টা করলো এই ভেবে যাতে মা-বাবাও একটু ঘুমুতে পারেন।

আর যেদিন সকালে তার জ্বর ছাড়লো সেদিন ছোট-ছোট রোগা-হাতে ভাইকে সে টেনে নিলো বিছানায়, তার কচি-কচি নরম গালে চুমু খেয়ে বললো, ভাই, তুমি মিট্টি—তুমি ভা-ও। বিজ্ঞের মতো বাবুইও মাথা হুলিয়ে প্রতিধ্বনি করলো, 'ব-ই মিট্‌টি—দিদ্‌দি বা-ও।'

দুই বোন

টুলু দিদি-অন্ত প্রাণ। ঝগড়া কিন্তু ততোধিক। একদণ্ড যেমন দিদি নইলে চলে না—আবার একদণ্ড সে ঝগড়া না-ক'রেও থাকতে পারে না। এমনিতেই তো দিদি যে তার চাইতে অনেক বড়ো তাই নিয়েই তার পরম অভিমান—তার উপরে দিদির কত বিদ্যে। বগলে ব্যাগ ঝুলিয়ে সে ট্রাম-লাইন পেরিয়ে একা-একা ইস্কুল যায়, মোটা-মোটা ছবিওলা বই পড়ে—সমবয়সী বেণীঝোলানো বন্ধুদের সঙ্গে আড়ি করে, ভাব করে—পাঁচ বছরের টুলু তার দশ বছরের দিদির এই সব অসাধারণ কীর্তি দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে দেখে, শোনে, শেখে, আর ঈর্ষায়, ভক্তিতে, ভালোবাসায়, বিরক্তিতে হৃদয়ের মধ্যে একটা কেমন যন্ত্রণা উপভোগ করে। কখনো-কখনো তার লাবণ্যভরা টুলটুলে মিষ্টি মুখে হাসি আর ধরে না, কখনো-কখনো ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া ঘন তার কালো চুলের তলা থেকে তার ততোধিক কালো বড়ো-বড়ো দুই চোখে একটুও জল না-এলেও চীৎকার ক'রে বাড়ি মাথায় করে। মাঝে-মাঝে অবিশ্যি বুলু ভীষণ চটে যায় তার ব্যবহারে, ঠাস্ ক'রে একটা চড়ও মারে কখনো-কখনো, কিন্তু সে খুব কম। বেশির ভাগ সময়েই ভারি ভালো লাগে তার ছোটো বোনের ভাব-ভঙ্গী দেখতে। ফোলা-ফোলা গালে নিজের কমফোলা দশবছরের কচি গাল ঠেকিয়ে—আদর করতে করতে বলে, 'দুষ্টুটা, হিংসুটিটা'···আর টুলু দিদির সেই আদরে গা ঢেলে দিয়েও যেন আদর চায় না এমন একটা ভঙ্গিতে দিদিকে ঠেলে দিয়ে বলে, 'যাও তুমি, তুমি ভালো না, তুমি দুষ্টু, তুমি হিস্‌কুটি'···

দিদি যখন ইস্কুলে যায় ভারি কষ্ট হয় তার। সারাটা দুপুর আর কাটতে চায় না। এদিকে ঘুমিয়ে থাকবার মতোও ছোটো না, ইস্কুলে যাবার মতোও বড়ো না—ভারি মুশকিল হয়। মা তো খেয়েই ঘুম—বাবা আপিশ—সে কী করে? কেবল খিদে পেতে থাকে। ঘুমন্ত মাকে

বারে-বারে বিরক্ত করে, দু-একবার ঘুমে ভরা চোখ মেলে মা তাকান, আবার ঘুমিয়ে পড়েন। বিরক্ত করে ব'লে মা আজকাল বুলুর টিফিনের সঙ্গে টুলুকেও একপ্রস্থ খাওয়ান—কিন্তু তাতে কী, টুলুর আবার খিদে পায়। ঘড়ি দেখতেও জানে না যে বারে-বারে সময় দেখবে—সারাদিন ঘুরঘুর ক'রে ছোটো বাড়িটাতে ঘুরে বেড়ায়—কাজে-অকাজের আবর্জনায় গন্ধমাদনের সৃষ্টি করে ঘরে ঘরে—নিজের পুতুলগুলোকে একবার শোওয়ায়, একবার বসায় —বারে বারে ন্যাতা ভিজিয়ে ঘর মুছে ভাসিয়ে দেয়—বাবার টেবিল ঘাঁটে, দিদির পরিত্যক্ত পেন্‌সিল কাগজ নিয়ে বিজ্ঞের মতো লেখাপড়া করে আর তারপরে দক্ষিণের বারান্দা থেকে রোদ স'রে গিয়ে যখন কোণাকুণি দাঁড়ায়, তখন রাস্তার ধারের ছোটো সরু বারান্দায় বসে পা দু'লিয়ে গান গায় আর দিদির প্রতীক্ষায় ব্যাকুল দৃষ্টি ফেলে রাখে রাস্তার উপর। দূরে দিদির লাল ছাতাটি দেখতে পেলেই আনন্দে লাফিয়ে ওঠে সে—চীৎকার করতে থাকে, 'দিদি, শোনো···মা আমাকে আজ তোমার চাইতে বেশি খেতে দিয়েছে, বাবা আজ আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে ··তোমাকে নেবে না···আমি দুটো পান খেয়েছি···' দিদির ঈর্ষা উৎপাদন করবার যা-যা বুদ্ধি তার মাথায় খেলে, সব ক'টাই সে প্রয়োগ করতে থাকে। দূর থেকে দিদি একটু-একটু হাসে—টুলুর সারা শরীর জুড়িয়ে যায়। তারপর দু'বোনকে মা খাবার ঠিক ক'রে দেন—খেতে-খেতেও সে দিদির সঙ্গে ঝগড়া না ক'রে পারে না—সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে দিদির বাটিটার দিকে এক নজর দেখেই আন্দাজে কেঁদে ওঠে—আমি খাবো না, আমার কম, দিদির বেশি।' মা ধমক দেন—কিন্তু কে শোনে কার কথা। বুলু মেজাজ খারাপ ক'রে বলে, 'এক থাপ্পড় মারবো। খেলায় নেবো না তোকে—ভারি আহ্লাদি হয়েছিস, না?' টুলু তক্ষুনি ধরাশায়ী। শুধু ধরাশায়ীই না—একেবারে শোবার ঘরের খাটের তলায়। কথায়-কথায় তার রাগ লেগে আছে—আর রাগলেই খাটের তলা। মা বিরক্ত হ'য়ে বলেন, 'এলি দুষ্টু মেয়ে? সারাদিন ঝগড়া আর ঝগড়া—'

খাটের তলা থেকেই কান্নাবিজড়িত গলায় সে জবাব দেয়—'দিদি দুষ্টু, মা দুষ্টু, বাবা দুষ্টু, আমি ভালো—'

বুলু মা'র দিকে তাকিয়ে হাসে, মা বলেন, 'যা একটু, ডেকে আন ওটাকে, সারাদিন জ্বালিয়ে দিলো আমাকে।'

বুলু বলে, 'থাক গিয়ে, যেমন পাজি তেমনি শাস্তি হোক—হিংসুটি…'

'যা লক্ষ্মী তো—এই দেখ এই খাবারগুলো নষ্ট হ'য়ে গেলো—তুমি তো ওর দিদি—তুমি তো লক্ষ্মী দিদি—মা আদরের সুরে বলেন। টুলু মুখে 'না না' বলে, কিন্তু ওর দশ বছরের মেয়ে-মনও কোথায় যেন স্নেহের আস্বাদে ভ'রে ওঠে। প্রথমটা গলা চড়িয়েই ডাকে, 'নে, আয়, খেয়ে নে—দুষ্টু মেয়ে…'

'না, আমি আসবো না।'

'তবে কিন্তু মঞ্জুদের ছাতে খেলতে নেবো না।'

এইবার টুলুর ছোটো মাথা খানিকটা বেরিয়ে আসে খাটের তলা থেকে—কিন্তু মুখে বলে, 'না নিলে!'

'ঠিক?'

'আমি কী জানি!'

'তবে খেতে আয়।'

'আমাকে না-ছাধলে আমি খাবো কেমন ক'রে?'

বুলু চেঁচিয়ে হেসে ওঠে। বুলুর মাও। তারপর হাত বাড়িয়ে তিনিই কাছে টেনে এনে চুমু খেয়ে খেতে বসান। বুলু জামা পরিয়ে, মাথা আঁচড়ে নিয়ে যায় নিজের সঙ্গে খেলতে।

এই ক'রে-ক'রে দিদির ছায়া হ'য়ে ঝগড়ায় আর সুগভীর ভালোবাসায় টুলু বড়ো হ'য়ে উঠলো। একসঙ্গে ইস্কুলে যাওয়া, একসঙ্গে খাওয়া, একসঙ্গে বেড়ানো, এক বিছানায় পাশাপাশি শোয়া—একেবারে নিরবচ্ছিন্ন দু'জন সঙ্গী। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে বুলু যে-বছরে কলেজে ভর্তি হ'লো—টুলু

গর্বিত হ'লো খুব। দিদি সকালবেলা উঠেই কী সুন্দর শাড়ী পরে ট্র্যামে চ'ড়ে কলেজে চ'লে যায়—এ-দৃশ্য কি অবহেলা করবার! কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একটা বিচ্ছেদের কষ্টও অনুভব করলো সে। বুলু যখন ফিরে আসে তখন তার ইস্কুল যাবার সময়, কাজেই দুপুরটাও দু'বোন দেখা হয় না। ইস্কুলটাই বিস্বাদ হ'য়ে গেলো টুলুর কাছে। যে-ইস্কুলে যাবার জন্য তার গরজের অন্ত ছিলো না—আজকাল কোনো অছিলায় সে-ইস্কুলই তার কামাই করতে ইচ্ছে করে। অবিশ্যি আস্তে-আস্তে তার অভ্যেস হ'য়ে এলো এই বিচ্ছেদ—আর তারপর একদিন সেও তো কলেজে যাবে এই কথা ভেবেই মনে-মনে অনেকটা শান্ত হ'লো।

কিন্তু এর মধ্যেই বাড়িতে একটি নতুন আবহাওয়া দেখা দিল যেন। দু'চারজন অপরিচিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার আনাগোনা—মা বাবার সহাস্য অভ্যর্থনা, দিদির সলজ্জ চেহারা—সবটা মিলিয়ে অন্য রকম একটা-কিছু ভাবতে-ভাবতেই সে খবর জানলো—দিদির বিয়ে।

রাত্রিবেলা ঘুমুতে এসে টুলু বললো, 'দিদি, তোর বিয়ে?'

বুলু জবাব দিল না। উশখুশ ক'রে টুলু আবার বললো, 'বিয়ে খুব মজার—কিন্তু বিয়ে হ'লে যে চ'লে যায়। তুইও যাবি?'

ছেলেবেলা থেকেই বুলু যেমন গম্ভীর আর বড়োসড়ো—টুলু তেমনি ছেলেমানুষ। এই বারো বছর বয়সেও তার মুখে শিশুর আভা। বুলু ছোট বোনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বুকের মধ্যে একটা কষ্ট অনুভব করলো। এই বিয়ের ব্যাপারে তার নিজের মনটা ভালো লাগছিলো না, টুলুর কথা শুনে আরো কেমন হ'য়ে গেল। চুপ ক'রে শুয়ে রইলো বিছানায়। জবাব না-পেয়ে অভিমান হ'লো টুলুর—রাগ ক'রে দিদির গায়ে ঠেলা দিয়ে বললো, 'আচ্ছা, বেশি অহংকার কোরো না··· ভেবেছো বুঝি এক তোমারি বিয়ে হলো এ-সংসারে···একদিন আমারো হবে···তখন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো না।'

হেসে ফেললো বুলু, দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো টুলুকে, আদর ক'রে বললো, 'আচ্ছা।'

দিদি আদর করলে এখনো ছেলেবেলার মতো অনুভূতি হয় টুলুর। বুলুর গায়ের উপর আলগোছে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ভারী গলায় বললো— 'সত্যি তুই আমাকে ছেড়ে চ'লে যাবি নাকি বল না ?'

'পাগল নাকি ! আমি কি তোকে ছেড়ে একবেলাও থেকেছি ?'

'বিয়ে হ'লে তো শ্বশুরবাড়ি চ'লে যায়—'

'আমি যাবো না।'

'তাই ভালো—' আশ্বস্ত হ'য়ে বুলু উঠে বসলো। একটু শান্তি পেলো মনের মধ্যে।

এদিকে বিয়ে ঠিক হবার অল্পদিনের মধ্যেই বাড়িতে একটা ব্যস্ততার সাড়া প'ড়ে গেলো। মা ব্যস্ত, বাবা ব্যস্ত, আসছে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-কুটুম্ব······বুলুও যেন কেমন উন্মনা······মাঝে-মাঝে মাকেও সে নির্জনে এ-জানলায় ও-জানলায় বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে—টুলুর মন-কেমন করে। শুকনো মুখে আরো জড়িয়ে থাকে দিদিকে—একদণ্ড ইচ্ছে করে না চোখের আড়াল করতে। তারপর একদিন সকালবেলা সানাই বেজে উঠলো, আর রাত্রিবেলা আলো জ্বালিয়ে বাজনা বাজিয়ে দিদির বিয়ে হ'য়ে গেলো একজন যুবকের সঙ্গে। ফরসা ছিপছিপে ছেলেটি। গরদের ধুতি পাঞ্জাবি প'রে ফুলের মালা গলায় দিয়ে তাকে ভালোই দেখাচ্ছিলো দিদির পাশে—'। আর দিদি ! দিদির দিকে তাকিয়ে টুলু একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। চন্দনে কাজলে বিধুরতায় মধুরতায় মাখামাখি সে-মুখ—টুলুর শিশু-মনেও দোলা লাগলো। অনেক রাত্রে লগ্ন ছিলো বিয়ের—কাজেই অর্ধেক বিয়ে দেখেই একগাদা কাপড়ের উপর ঘুমিয়ে পড়লো টুলু। সেদিন আর রাত্রিতে দিদির সঙ্গে একঘরে শোবার এই প্রথম বিচ্ছেদটা তাকে ভোগ করতে হ'লো না। পরের দিন সকালে উঠে বাড়ির চেহারা দেখে সে

অবাক হ'য়ে গেলো। এদিকে বিয়ের অনুষ্ঠান, অন্যদিকে বিদায়ের আয়োজন। দুই চোখের জলে ভাসতে-ভাসতে মা ট্রাঙ্ক গুছোচ্ছেন, স্থাণুর মতো ব'সে আছেন বাবা। আর দিদি যেন ঠিক একটি কলের পুতুলের মতো সব অনুষ্ঠান করে যাচ্ছে—স্বল্প ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তার জলভরা চোখ দেখে টুলু হঠাৎ কেঁদে ফেলে ছুটে পালিয়ে গেলো সেখান থেকে। কেউ তাকে লক্ষ্য করলো না, কেবল বুলু একবার মুখ তুলেই চঞ্চল হ'য়ে উঠলো খসখসে বেনারসির আড়ালে।

আংটি-খেলা, চাল-খেলা—শতকোটি অনুষ্ঠান সেরে যে-মুহূর্তে ছাড়া পেলো বুলু—ছুটলো সে বোনের খোঁজে। ঘুরে-ঘুরে তেতলার চিলকুঠির ছাতে পাওয়া গেলো তাকে। মাটিতে গড়িয়ে-গড়িয়ে শিশুর মতো কাঁদছে সে। বুলু গলা দিয়ে একটি আওয়াজ বার করতে পারলো না—এক গা গয়না নিয়ে—একরাশ কাপড়ের স্তূপ নিয়ে সেও দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠলো অসহায়ের মতো। কিন্তু এই নিদারুণ বিচ্ছেদের দিনেও তার মন খুলে কাঁদবার সময় কোথায়? আধ ঘণ্টার মধ্যেই আত্মীয়-স্বজনরা তাকে খুঁজেপেতে ধ'রে নিয়ে গেল নিচে। এক্ষুনি যেতে হবে—আর তার মধ্যেই তো সারতে হবে সব!

বিদায়ের সময় উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাতে লাগলো বুলু! টুলু? টুলু কই? বাবা এলেন আশীর্বাদ করতে—তাঁর দুই পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজে সে ফুঁপিয়ে উঠলো—ক্রন্দনমুখী মাকে ধ'রে নিয়ে এলেন কোনো আত্মীয়া—তিনি আশীর্বাদ-বাক্য উচ্চারণ করতে পারলেন না, দুই স্নেহ-ব্যাকুল আলিঙ্গনে মেয়েকে বুকের মধ্যে সাপটে নিলেন শুধু। তারপর একে-একে সবাই এলো—এলো না টুলু। উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে, চির-কালের মতো এ-বাড়ি থেকে পর ক'রে দেয়া হ'লো বুলুকে—গাঁটছড়া বেঁধে আবাল্যের আবাস ছেড়ে, মা-বাবাকে কাঁদিয়ে,—ছোটো বোনকে চোখের আড়াল ক'রে মোটরে চড়ে সে চ'লে গেল শ্বশুরবাড়ি।

আবার কিন্তু দু'দিন পরেই ফিরে এলো সে তার সেই পরিচিত অভ্যস্ত আবাসে। আনন্দে ঝলমল করতে-করতে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হ'লো দুই বোন। তাদের দু'জনের চোখের জল মিলিত হ'লো হাসির রেখায়। আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব সকলের চোখ ছলছল ক'রে উঠলো দৃশ্য দেখে। তারপর অষ্টমঙ্গল পর্যন্ত চারটে দিন টুলু একেবারে দিদির নয়নের মণি হ'য়ে কাটালো। তাছাড়া ভগ্নীপতিকে তার বেশ ভালোই লাগছিলো। চমৎকার ভদ্রলোক—সারাক্ষণ দুষ্টুমি করে তার সঙ্গে, দিদির বদলে তাকে নিয়ে চ'লে যেতে চায়, আরো যে কী সব মধুর ঠাট্টা করে, ভালো ক'রে বোঝে না টুলু, কিন্তু রোমাঞ্চিত হয়।

কিন্তু এ-স্বপ্ন তো মাত্র চার দিন। আবার বুলু চ'লে গেলো সকলকে কাঁদিয়ে। এবার শুধু বুলুই গেলো না, আত্মীয়-কুটুম্ব সবাই চ'লে গেলো বাড়ি খালি ক'রে। বুলুহীন বাড়ি যে কী মর্মান্তিক-রকমের শূন্য, সে-কথা এ-বাড়ির তিনটি প্রাণীই সমান উপলব্ধি ক'রে যেন ক'দিন পাগলের মতো হ'য়ে রইলো। জীবনের সব আনন্দ নিংড়ে নিয়ে চ'লে গেছে বুলু। তবু বিচ্ছেদ দিয়ে ভরা দিনগুলিও ধীরে-ধীরে কাটতে লাগলো। একদিন, দু'দিন, তিনদিন ক'রে-ক'রে একমাস কেটে গেল। একদিন অন্তর চিঠি লেখে বুলু, টুলু একবার প্রকাশ্যে চেঁচিয়ে, একবার মনে-মনে, আর অজস্র-বার লুকিয়ে-লুকিয়ে সেই চিঠি পড়ে—হয়তো মাও তাই—টুলুর মনে হয়, বাবাও তাই করেন। আস্তে-আস্তে বাড়ির বিষাদময় আবহাওয়া অনেকটা হালকা হ'য়ে এলো। আস্তে-আস্তে বুলুর অভাবে অভ্যস্ত হ'য়ে এলো তারা। তারপর টানা ছ-মাস যথারীতি সংসার চলবার পরে হঠাৎ খবর এলো, বুলু আসছে। ইস্কুল থেকে ফিরেই খবরটা পেলো টুলু। আহ্লাদে সে ভালো ক'রে খেতে পারলো না, বসতে পারলো না স্থির হ'য়ে, ক্রমাগত মা'র গলা জড়িয়ে ধ'রে-ধ'রে চুম খেতে লাগলো। রাত্রিতেও ঘুম হ'লো না ভালো—জেগে ঘুমিয়ে কেবল দিদির স্বপ্নই দেখলো সে।

পরদিন থেকে আর মন নেই কিছুতে। না স্কুল, না বাড়ি, না বন্ধু-বান্ধব, না গল্পের বই—কেবল ক্যালেণ্ডারে তারিখ গোনে আর বিড়বিড় ক'রে দিন আওড়ায়।

মা হেসে বললেন, 'তুই দেখছি, পাগল হ'য়ে গেলি রে!' লজ্জা পেয়ে টুলু জবাব দেয়, 'মোটেও না। দিদি যে আসবে সে-কথা আমার মনেও থাকে না।'

অবশেষে এলো সেই বাঞ্ছিত দিন। বাড়ি-ঘর গুছিয়ে আর বাকি রাখলো না টুলু। যেখানে সে দিদির সঙ্গে ঘুমুতো সেখানটা একেবারে ঝকঝক করতে লাগলো। কী দিয়ে যে কী করবে আর বুঝে ওঠে না—দিদিকে অবাক ক'রে দেবে—দিদি আশ্চর্য হ'য়ে ভাববে, টুলুটা এত গুছোনো হ'লো কেমন ক'রে। আর মা এদিকে আচার শুকিয়ে রেখেছেন, জামায়ের জন্য কতরকমের নারকোলের খাবার করেছেন—বড়ি-নাড়তে বৈয়ম ভর্তি।

আগের দিন রাত্রিটা কোনোরকমে কাটিয়ে শেষ-রাত্রেই টুলু উঠে ব'সে থাকলো স্টেশনে যাবার জন্যে। ভোর ছ'টায় আসবে গাড়ি,—তাগাদা দিয়ে বাবাকে পাগল ক'রে তার অনেক আগেই গিয়ে স্টেশনে হাজির হ'লো তারা। প্রতিটি দণ্ড পল মুহূর্ত ব'য়ে যেতে লাগলো টুলুর বুকের মধ্য দিয়ে। দূরে দেখা গেলো এবার এঞ্জিনের ধোঁয়া, তারপর ধ্বক্ধ্বক্ ঝক্ঝক্ করতে-করতে গাড়ি এসে দাঁড়ালো। কম্পিত বুকে প্রত্যেকটি কামরা দেখতে লাগলো তারা। একটি সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় দেখা গেলো দিদির মুখ উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে প্লাটফর্মের দিকে।

'এই যে বুলু!' বাবা তাকে পেছনে ফেলে হনহন করে এগিয়ে গেলেন। টুলুর যেন পা নড়তে চাইলো না—লজ্জায় আনন্দে বিবশ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ ক'রে। ভিড় গোলমাল ঠেলাঠেলি—সব এড়িয়ে তারা যখন বাইরে এসে ট্যাক্সিতে উঠলো—এতক্ষণে দিদি ভালো ক'রে তাকাতে

পারলো টুলুর দিকে। একখানা হাত আস্তে টেনে বললো, 'কী রে টুলু—চুপ ক'রে আছিস যে!' সে কিছু জবাব দেবার আগেই হঠাৎ ব্যস্ত হ'য়ে বললো, 'এই, আমার এ্যাটাচিকেসটা ঠিক আছে তো?' ভগ্নীপতি মৃদু হেসে টুলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখলে, টুলু, তোমার দিদির হুকুমটা একবার? আমি যেন ওর আর্দালি।'

'ফাজলেমি করতে হবে না—শোনো, আমার কাপড়ের স্যুটকেসটা কিন্তু চাবি ছাড়া আছে—ভিতরে দিলেই ভালো হয়।'

টুলু অবাক হ'য়ে দিদিকে দেখতে লাগলো। নিজের জিনিশ নিয়ে ও ব্যস্ত হ'তে শিখেছে। সিঁথির সিঁদুরে, মাথার ঘোমটায়, শাঁখাতে-লোহাতে মিলিয়ে একেবারে যেন অন্য মানুষ লাগলো তাকে। ভগ্নীপতি হয়তো কিছু একটা রসিকতা করতে যাচ্ছিলেন—বুলুর বাবা কুলিভাড়া মিটিয়ে এসে গাড়ির দরজায় দাঁড়ালেন—জিনিশপত্র উঠেছে তো? তুমি দাঁড়িয়ে কেন, সুধীন, উঠে পড়ো।' লক্ষ্মী ছেলের মতো সুধীন উঠে বসলো গাড়িতে।

বাড়ি পৌঁছতেই মা ব্যাকুল-হাতে জড়িয়ে ধরলেন কন্যাকে—বুলু হাসিমুখে মাকে প্রণাম করলো।

চায়ের আয়োজনে মা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন, বুলু ঘুরে বেড়াতে লাগলো সারা বাড়ি। এ-ঘর ও-ঘর—প্রতিটি পরিচিত জিনিশ সে নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলো—টুলু শুকনো মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগলো দিদির পিছনে-পিছনে। দিদির কাছে সে যে কী চায় নিজেও ঠিক বোঝে না, কিন্তু তার কাছে যেন ঠিক এই আশা করে নি। ঘুরতে-ঘুরতে আর দিদির দু'একটা কথার জবাব দিতে-দিতে হঠাৎ যেন তার মন-কেমন করতে থাকে। মনে হয় এ-যেন তার দিদি নয়—সুন্দর শাড়ি আর গয়না পরা, মাথায় সিঁদুর দেয়া, খুশিতে উপচে-পড়া এ-মেয়েটি বুঝি আর-কেউ। বারে-বারে তাকিয়ে দেখে আর কেমন একটা অভাববোধ বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে।

বিয়ের দু'দিন পরে ঘুরে এসে দিদির সেই ব্যাকুল আলিঙ্গনের কথা মনে পড়ে যায় তার।

একটু পরে বুলু স্নান করতে চ'লে গেল। যাবার মুখে বললো, 'টুলু, তুই কখন স্নান করিস রে? তোর জন্যে কী সুন্দর শাড়ি এনেছি দেখিস।'

শাড়ি দিয়ে কী করবে টুলু? শাড়ি আর দিদি নাকি সমান? ছ'মাস আগে—বুলুর যখন বিয়ে হয়নি তখনো সে বোনকে নিয়ে স্নান করেছে—জোর ক'রে সাবান মাখিয়ে দিয়েছে তাকে—ফ্রক কেচে দিয়েছে—মাথা আঁচড়ে ফিতে বেঁধে দিয়েছে—জুতোর স্ট্র্যাপ বেঁধে দিয়েছে—ছোট্টো থেকে দিদির হাতেই এ-সব করতে অভ্যস্ত সে। আর দিদি যখন চ'লে গেলো কত যে তার কষ্ট হয়েছে এ-সব করতে—কত যে চোখ ভ'রে-ভ'রে জল এসেছে দিদিকে মনে ক'রে সে-কথা কে জানে? বাথরুমে গিয়ে বুলু দরজা বন্ধ ক'রে দিতেই তার ছোটো বুক অভিমানে ভ'রে গেলো। প্রাণপণ শক্তিতে কান্নাকে ঢোঁক গিলে ছুটে গেলো সে মায়ের কাছে—পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বললো, 'আমি ইস্কুলে যাবো, ভাত দাও।'

ছোটো মেয়ের দিকে নজর দেবার সময় আজ নয়। আচমকা ধাক্কা খেয়ে মা চ'টে উঠলেন, 'সর বলছি দুষ্টু মেয়ে, লোকজন দেখলে যেন বাড়ে!'

একটু না-স'রে অভিমান-রুদ্ধ গলায় টুলু বললো, 'না, আমাকে ভাত দাও, আমি ইস্কুল যাবো।'

'কেন, আজ ইস্কুল যাবার হ'লো কী! দিদি-দিদি ক'রে তো পাগল—এখন আবার ঢং করা হচ্ছে।'

'না, তুমি ভাত দাও।'

'বিরক্ত করিস না, টুলু—' মা মেয়ে-জামায়ের আহার্য প্রস্তুতে মন দিলেন।

'ভাত দাও!'

গলা থেকে হাত ছাড়িয়ে নিতে-নিতে মা রেগে উঠে বললেন, 'টুলু, সর বলছি—'

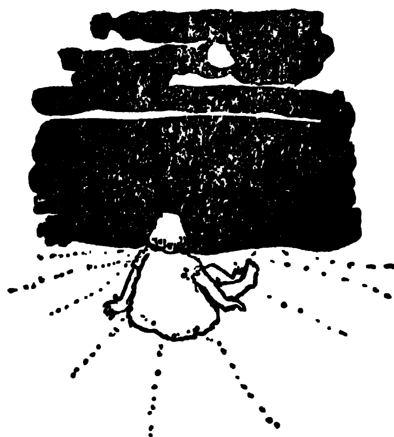
'আমি স্কুল যাবো, ভাত দাও।'

'না, তুমি ভাত পাবে না—' মা এবার সজোরে ঠেলে দিলেন তাকে। এই সামান্য আঘাতেই টুলু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো ছেলেমানুষের মতো।

মুখ ফিরিয়ে মা বললেন, 'একটা থাপ্পড় লাগিয়ে দেব, টুলু। বুড়ো-ধাড়ি মেয়ে, লজ্জা নেই—ভগ্নীপতি আছে ও-ঘরে, আর ও এখানে কাঁদতে লেগেছে।'

তবু টুলু নির্লজ্জের মতো কাঁদতে লাগলো।

দু'হাঁটুতে মুখ ঢেকে—একটা অনির্দিষ্ট দুঃখের আবেগে বুক ভেঙে গেল তার। সে-দুঃখ কত গভীর, কত মর্মান্তিক মা তার কিছুই জানলেন না,—কেউ জানবে না কোনোদিন—আর টুলুই কি জানে সে-কথা? তার কেবল মনে হ'তে লাগলো, দিদি যদি আর কোনোদিন না আসতো তবেই ভালো হ'তো—দিদি কেন এলো? আর যদিই বা এলো, তবে তার সেই দিদি কেন ফিরে এলো না?



পটলি

পটলি যে ভয়ানক দুষ্টু, ভয়ানক মন্দ, এ-কথা শেয়ালদর ইস্টিশন-পাড়ায় কে না জানে ? ব্যারাকের বাবুরা, গিন্নীরা, ছেলেমেয়েরা, কুলি-কাবারি কেরানী যাকেই জিজ্ঞেস করো না কেন, একডাকে তারা ব'লে দেবে কোন্ মেয়েটার নাম পটলি আর স্বভাবটি-ই বা তার কেমন। পটলি নিজেও জানে সে-কথা। মাঝে-মাঝে যখন ভীষণ মার খায় তার বাবার কাছে তখন যে মনটা একটু উদাস-উদাস না হয় তা নয়, কিন্তু আজে-বাজে ভেবে বেশিক্ষণ নষ্ট করবার তার সময় কই বলো দেখি ? ততক্ষণে পাড়ার সবচেয়ে বখা ছেলে নন্দার সঙ্গে দু-দান তক্কু খেললে কাজ দেবে।

মার মুখের বকুনি তো জলভাত, এদিকে কাকারা, পিসিরা, দুই দিদি—তারাও সব হয়রান হ'য়ে গেলো শোধরাবার চেষ্টায়। অসম্ভব! আট বছরের মেয়ে, সমস্তটি দিন সে রাস্তায়। নোংরা ফ্রক, ছাঁটা চুল এখন পর্যন্ত হাজার চেষ্টা ক'রেও তার মাথায় চুল রাখা গেল না। ছাঁটিয়ে না দাও, নিজেই কাঁচি চালিয়ে এবড়ো-খেবড়ো ক'রে মাথা মুড়িয়ে নেবে। বলে, 'আমার গরম লাগে, অসুবিধে হয়।' মা রেগে তেড়ে যান, 'তুই মেয়ে না ? ধেড়ে গোপাল হ'য়ে দিন-দিন কী বাহারই খুলছে তা কি দেখেছিস কোনোদিন আয়না দিয়ে ?' চড়টা-চাপড়টা বকুনিটা প্রায় সকলেই চাঁদা ক'রে চালাচ্ছে, কিন্তু বেঁধে রাখলেও দাঁত দিয়ে দড়ি কেটে বেরুবে সে।

পটলির ঘুম ভাঙে ভোর চারটেতে। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে টিপি-টিপি পায়ে সে তক্ষুনি বেরোয়। যতক্ষণ না রাস্তায় এসে দাঁড়ায় ততক্ষণ তার যেন দম বন্ধ হ'য়ে থাকে। ঘুরে-ঘুরে ঐ ইট-পাথরের পাড়া থেকে কেমন ক'রে যে চমৎকার-চমৎকার সব ফুল সংগ্রহ করে তা সে নিজেই কেবল জানে। সেইসঙ্গে মুলোটা, ডাঁটাটা, দুটো ঢ্যাঁড়স কিংবা পুঁইলতাও যে না আনে তাও নয়। তার বাবা ইস্টিশনের কনট্রোলার, পুরোনো লোক, মানুষ অত্যন্ত

ভালো। সবাই তাঁকে ভালবাসে, সবাই চেনে, সম্মান করে—কিন্তু এই মেয়ে নিয়ে লজ্জায় তিনি লোকের কাছে আর মাথা তুলতে পারেন না। সেদিন বড়োসাহেবের মালি যখন তাকে হাতে-নাতে ধ'রে নিয়ে এলো তাঁর সামনে, তখন তাঁর মনে হলো, ধরণী, দ্বিধা হও। ফুল চুরি করলে না-হয় কথা ছিলো, কিন্তু সাহেবের অত যত্নের একসার বাঁধাকপি উপড়ে এনেছে সে, একটি টোম্যাটোও রেখে আসেনি গাছে, তারপর বেগুন ছিঁড়তে গিয়ে ধরা পড়েছে। সাহেবের এই বাগানটির পেছনে মাসে প্রায় তিনশো টাকা খরচ। সে জানলে কি আর উপায় আছে ? মালির হাতে একখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে কাঁদো-কাঁদো গলায় নামটি একেবারে চেপে দিতে অনুরোধ করলেন প্রসন্নবাবু। তারপর ঘরের মধ্যে হিঁচড়ে টেনে এনে মারতে-মারতে রক্ত বার ক'রে দিলেন মেয়ের। কিন্তু পটলি স্থির। কিছুতেই তিনি মেয়ের মুখ দিয়ে এই কথাটি বলাতে পারলেন না যে, সে আর এ-রকম করবে না। ক্লান্ত হয়ে শেষে নিজেই থামলেন, এমন কি, একবেলা আপিশও কামাই হলো সেদিন।

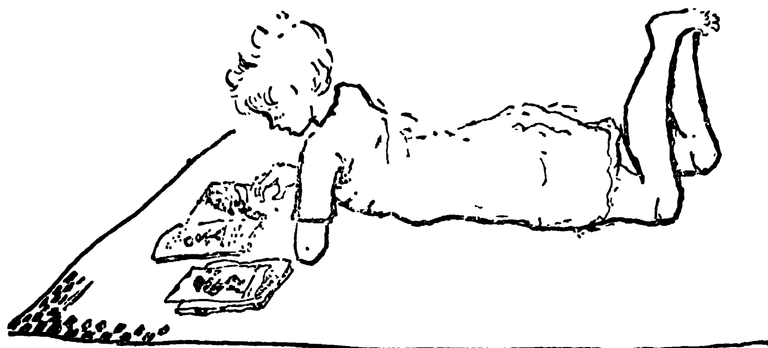
সকালটা নেহাতই শরীরের ব্যথায় একেবারে মরার মতো প'ড়ে রইল পটলি, তারপর খেয়ে-দেয়ে দুপুরেই সে হাওয়া। ফিরলো একেবারে সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। সে-সময়টায় প্রসন্নবাবু আপিশে থাকেন, মেয়েরা কাজকর্ম সেরে ছাতে বেড়ায়। ফাঁক-তাক বুঝে চুপি-চুপি এসে, যে-ছোট্ট কুঠ্‌রিতে ট্রাঙ্ক বাক্স থাকে, কাপড়ের আলনা আর জুতোর র‍্যাক থাকে, সেই ঘরে টাল-করা ছেঁড়া-খোঁড়া বাড়তি বিছানা-বালিশের পেছনে গুটিসুটি শুয়ে পড়লো নিঃশব্দে। শোয়ামাত্র ঘুম। খাটুনি তো বড়ো কম যায় না সারাদিন !

খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। রাত দশটা অব্দি তার পাত্তা না পেয়ে বাড়িসুদ্ধু সব ভেবে আকুল। শেষে খবর গেল আপিশ-ঘরে। প্রসন্নবাবু তৎক্ষণাৎ কাজকর্ম ফেলে হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এলেন। কী জানি যা মার মেরেছেন

সকালবেলা, মনের দুঃখে ট্রেনের তলায় কাটা পড়লো নাকি? পিসিরা ফিশির-ফিশির লাগালো, দুই দিদি চোখ টান ক'রে বাবাকে দোষ দিতে লাগলো, আর মা গালে হাত রেখে জানলায় চোখ পেতে চুপ। বুকের মধ্যে কেমন করছে তাঁর। প্রসন্নবাবু সারাদিনের ক্লান্ত শরীর নিয়ে স্টেশন-পাড়াটুকু চ'ষে ফেললেন। লণ্ঠন নিয়ে রেল-লাইনগুলো সব দেখলেন। তাদের ব্যারাকে সাড়ে-তিনখানা কুঠুরি নিয়ে চল্লিশঘর রেলওয়ে কর্মচারীর বাস। পাঁচতলা বাড়ি। সব ক'টা তলা সকলে মিলে ঠ্যাং ভেঙে-ভেঙে খুঁজলো। কোথায় সে? এগারোটায় যখন পুলিশে খবর দিতে বেরুচ্ছেন, তখন কাতি-ঝি চেঁচিয়ে উঠলো—'ও মা, দেখ'সে তোমার মেয়ের কাণ্ড!' ততক্ষণে জেগে ব'সে বেশ ক'রে মজা দেখছে পটলি। কে জানবে বলো যে এই একটি বাক্সের মতো ঘরে, ঐ আবর্জনার স্তূপে, এই অসহ্য গরমে আর মশার কামড়ে এমন নিশ্চিন্ত ব'সে থাকতে পারে একটা মানুষ! বকবে কী, তার ছোট-ছোট শাদা দাঁত বার-করা একগাল হাসিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে সব হতভম্ব।

প্রসন্নবাবুর বলতে গেলে সারাদিনই আপিশ। কাছাকাছি বাড়ি, দরকার-মতো আসেন। যেমন—সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে যান আবার বারোটায় খেতে আসেন, খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'রে চ'লে যান, আবার পাঁচটায় এসে চা খেয়ে যান। আর এই যে যান, আর আসেন রাত বারোটায়। বাবার গতিবিধির সঙ্গে পটলির গতিবিধি রুটিন করা; কারণ, একমাত্র বাবাকেই সে ভয় করে। অন্য কোনো কারণে না, বাবার শরীরে তার চাইতে ঢের বেশি জোর ব'লে তিনি যখন মারেন তখন কিছুতেই সে হাত ফসকে পালাতে পারে না। দু'দিন অবিশ্যি পুলিশ-পুলিশ ব'লে চেঁচিয়েছিলো, কিন্তু তাতে বাবা আরো মারলেন। তাই ক'দিন থেকে ভাবছিলো, পাড়ার বয়েজ এ্যাসোসিয়েশনের কুস্তির আখড়ায় ভরতি হবে। পুলিশ ডেকে বাবাকে ধরিয়ে দেয়া কিম্বা কুস্তির প্যাঁচ শিখে হাত ফসকে পালিয়ে যাওয়া,

এ ছুটো বুদ্ধিই অবিশ্যি নন্দাই তাকে দিয়েছিলো। মা বলো, বাপ বলো— এই পৃথিবীতে নন্দার মত বন্ধু তার আর কে আছে? কিন্তু মুশকিল হ'লো এই যে সেখানে ভরতি হতে আবার চাঁদা লাগে। বাবা আপিশে যাবার পরে, একপেট খেয়ে জানলার ধারে ব'সে-ব'সে এসব কথাই সে ভাবতে লাগলো। তারপর হঠাৎ মাছুর বিছিয়ে তিনখানা ছেঁড়া বই নিয়ে সটান মাটিতে উপুড় হ'য়ে শুয়ে হাঁটু থেকে নিচের ঠ্যাং ছু'টো আকাশের দিকে তুলে নাচাতে-নাচাতে প্রচণ্ড জোরে পড়তে শুরু ক'রে দিলো। মা ছুটে এলেন রান্নাবান্না ফেলে, পিসিরা এলো, দিদি ছু'জন হেসে-হেসে এ ওর গায়ে ঢলে



...আরে আমাদের পটলি দেখছি একদিনেই মানুষ হয়ে গেল

পড়লো, 'আরে আমাদের পটলি দেখছি একদিনেই মানুষ হয়ে গেল, এ্যাঁ? মারের চোটে তাহ'লে সত্যি ভূত পালায়?' এসব টিপ্পনি শুনলেই মাথায় রক্ত চড়ে পটলির, তৎক্ষণাৎ জেদ বেড়ে যায়, সেই সব অপকর্ম করার জন্য। আজ একবার কটমট ক'রে তাকিয়েই নিজেকে সামলে নিলো।

ছুপুরে বাবা এসে সব শুনে দারুণ খুশি। কচি শরীরের এখানে-ওখানে কালকের মারের কালসিটের দিকে তাকিয়ে পুরো একটা টাকাই তিনি দিয়ে ফেললেন চকোলেট খাবার জন্য। ব্যস্! বাবা বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গেই

আর পটলিকে পায় কে? বেরিয়ে প্রথমেই সে গলির মোড়ে। তাদের বাকি কাপড়-চোপড়ের দোকানে গিয়ে একটা হাফ-প্যান্ট আর হাফ-শার্ট কিনলো (এটাও নন্দার বুদ্ধি। মেয়ে দেখে যদি কুস্তিতে না নেয় তাই ছেলে সেজে যাওয়াই ভালো), গাছতলায় নাপিতের কাছে ব'সে ঘাড় চেঁছে ছ'আনার বাটি-ছাঁট দিলো, তারপর দু'আনার ফুলুরি কিনে খেতে-খেতে আমিরি চালে বসলো এসে ইস্টিশনের কুলিদের আড্ডায়। তারা তখন দু'টার গাড়ি পাস করিয়ে গান গাইতে-গাইতে বড়ো-বড়ো কানি-উঁচু কাঁসারিতে লঙ্কা দিয়ে ছাতু মাখছে। পটলিকে দেখে খুশি হ'য়ে উঠলো—'হারে, হামাদের পটলি মায়ি যে, আও আও। সারা সকাল তুমি কোথায় ছিলে?' পটলি মাথা নেড়ে মুচকি-হাসলো, তারপর হাতের মুঠোয় ঘামভরা পয়সাগুলো টুনটুন আওয়াজ করতে-করতে একডালা ছাতু তুলে মুখে দিয়ে বললো, 'সকালমে হাম আর নাই আয়েগা, রঘুয়া।'

'কাঁহে?'

'হাম কুস্তি লড়েগা, সকাল-বিকাল দো টাইম মে।'

'বা, বা, ইতো বহুৎ আচ্ছি বাৎ হ্যায়!'

'আজ হাম চার বাজে আখড়ামে চল যায়েগা। এই দেখো, চাঁদা ভি হ্যায় হামারা পাস।'

বুড়ো কুলির চোখ গোল-গোল হ'লো। তবতো বহুৎ বড়হা আদমি হো যাতা তোম, এ্যাঁ! খাও, খাও, ফুর্তিসে আউর থোড়া ছাতু খাও।' ঘাড়ছাঁটা পটলি ফুর্তিসেই ছাতু খেতে লাগলো। এই সময়ে সে রোজই এদের সঙ্গে খায়। এটা তার লাঞ্চটাইম।

তারপর এলো তিনটের গাড়ি। হুড়োহুড়ি ক'রে কুলিরা মাল নামাতে চ'লে গেলো, একটা লোহার বেঞ্চির উপর পা ঝুলিয়ে ব'সে-ব'সে দেখতে লাগলো পটলি। স্রোতের মতো মানুষ—মাথায়-মাথায় কালো—চুপ-চাপ জায়গাটা হঠাৎ যেন একটা ভোজবাজির মতো মুহূর্তে গমগম ক'রে

উঠলো। পানবিড়ির চীৎকার, গরম চায়ের হাঁক, আপেল-বেদানার ঠেলাগাড়ি, হুইলারের দোকানে ভিড়, ইঞ্জিনের ধোঁয়া, শান্টিংয়ের আওয়াজ, তীক্ষ্ণ হুইসিল—সব মিলিয়ে একটি যেন রূপকথার রাজত্ব। কোন্ জাদুকর ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলো? সোনার কাঠি ছুঁইয়ে ঘুম ভাঙালো কে? একটু পরেই আবার সব চুপ।

সেদিন কী জানি কেন, বড়ো কুলি হ'তে সাধ গেলো পটলির। কুলিদের মতো সুখী ত্রিভুবনে আর কাউকেই মনে হ'লো না তার। তাদের কেমন মা নেই, বাবা নেই, কেমন তারা ইচ্ছে মতো খায়-দায় ঘুমোয়, কতো রোজগার করে—না, আখড়ায় সে আর যাবে না, কাল থেকে নিশ্চয় সে কুলি হবে। তৎক্ষণাৎ বাকিতে কেনা শার্ট প্যান্ট রেল-লাইনে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

প্রসন্নবাবুর আপিশেই কাজ সবসময়। স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে বছরে এক-দিনও আসেন কিনা সন্দেহ। দিনচারেক পরে বিশেষ কোনো-একটা উপলক্ষ্যে একজন বন্ধুর সঙ্গে তিনি প্ল্যাটফর্মে এলেন সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জার এসে সবে থেমেছে। খুব ভিড়, পা ফেলার জায়গা নেই। আস্তে এগুতে-এগুতে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন। পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝলঝলে মস্ত রেলওয়ে কোট গায়ে দিয়ে ছোট্ট পটলি ছুটে-ছুটে মাল নামাচ্ছে গাড়ি থেকে। প্রথমটায় তিনি বুঝতে পারেননি, কিন্তু ধরনটা যেন কেমন চেনা-চেনা। লক্ষ্য ক'রে তিনি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। কে যেন মাটির সঙ্গে আটকে দিল তাঁর পা! আর এগুতে পারলেন না, সোজা ফিরে এলেন আপিশে। সেখানে এসে ঝিম ধ'রে ব'সে রইলেন খানিক, তারপর আরেক-জনের উপর ডিউটি ছেড়ে ছটফটিয়ে বাড়ি চ'লে এলেন। পটলি একটু পরেই বাড়ি এলো। সেদিন বাড়িতে মাংস রান্না হচ্ছিলো। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতেই তার গন্ধে পটলির মন খুশিতে ভরপুর হ'য়ে উঠলো। পেটের নাড়িভুঁড়ি মোচড় দিয়ে উঠলো খিদেয়। দরজা ঠেলে

ঢুকতে-ঢুকতে ছোড়দিকে সামনে পেয়ে একগাল হেসে বললো, 'হ্যাঁরে ছোড়দি, পোসোন্নবাবুর দেখছি আজকাল বেশ টাকাকড়ি হয়েছে, কেমন মাংস-টাংস আসছে বাড়িতে!' বলতে-বলতেই থেমে গেল—ছোড়দি কই! এ যে বাবা! যেন বাঘ আর হরিণ। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণের জন্যে একেবারে চুপ। তারপরে মুহূর্তে কিসে থেকে যে কী হ'লো—বাবা একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার উপর। অত বড়ো হাতের পাতার একটা চড়েই উল্টে সে মাটিতে পড়লো, তারপর আরেকটা, আরেকটা, আরেকটা—একটা দাঁত ভেঙে গাল থেকে রক্ত ছুটলো। হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এলেন মা, মেয়েকে একেবারে বুকের তলায় আড়াল ক'রে দাঁড়ালেন। কিন্তু প্রসন্নবাবু যেন উন্মাদ হয়ে গেছেন…কাকে মারছেন, কী করছেন কিছুই যেন জ্ঞান নেই তাঁর। কেটে ফেললেও যে মেয়ের মুখ দিয়ে আজ পর্যন্ত একটি টুঁশব্দ বেরোয়নি, সে হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো, 'বাবা, মাকে মেরো না, মাকে মেরো না—এই যে আমি, এই যে আমি!' মার বুকের তলা থেকে প্রাণপণে ছিটকে বেরিয়ে এলো সে—'মারো, মারো, মেরে ফেল আমাকে। মাকে না, আমার মাকে না।' অ্যাঁ! এ তিনি কাকে মারছিলেন? স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে প্রসন্নবাবু অবাক হয়ে গেলেন। তারপর মাথা নিচু করে আস্তে ঘরে চ'লে গেলেন।

তারপর একদিন, দু'দিন, তিনদিন কেটে গেল; বাড়ির আর-আর সব যেমন তেমনই চলতে লাগলো, কিন্তু পটলির মা যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। সব সময়েই তিনি চুপ, সব সময়েই গম্ভীর। তবু আর সকলের সঙ্গে যেমন-তেমন, পটলির সঙ্গে একটি কথা তিনি বললেন না এ কয়দিনের মধ্যে। রাত্রে এক বিছানায় শুয়েও যেন কত দূরের মানুষ তিনি! ভুল করেও তো মানুষ একবার গায়ে হাত দেয়? একবার কাছে টানে? পটলি ইচ্ছে ক'রে পা ছোঁড়ে, খালি মাথায় শুয়ে থাকে, বিছানা থেকে গড়িয়ে মাটিতে চলে যায়, মা তাকিয়েও দেখেন না। যেন পটলি তাঁর

কেউ নয়, পটলি বলে কেউ কোনোদিন ছিল না তাঁর। চার দিনের দিন আর পারলো না সে ; মার বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

মা বললেন, 'কাঁদিস কেন ?'

'তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো না কেন ?'

'আমার কথা কি তুই শুনিস ?'

'শুনবো।'

'শুনবি ?'

'হ্যাঁ মা, শুনবো। সব শুনবো।'

'তবে শোন, আর আমাকে কষ্ট দিস না, লজ্জা দিস না, তোর বাবার মাথা হেঁট করে দিস না লোকের কাছে।'

'তা-ই হবে মা, তাই হবে।'

'তা-ই হবে ?'

'তা-ই হবে।'

মা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে চুমু খেলেন।

এর পরে তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগবে, পটলি কি সত্যিই তার কথা রেখেছিল ? সত্যিই কি ভালো হয়েছিল ? আমি তখন তোমাদের উল্টো প্রশ্ন করবো—তোমরা হলে কি করতে ?

প্রতিবেশী

রাত্তিরে শুতে এসে বাবা-সাপ বললেন, 'ছাখো, একটা কোলা-ব্যাং খেতে গিয়ে অনেকক্ষণ সেটা গলায় আটকে ছিল। সেই থেকে গলাটাও ব্যথা, শরীরটাও খারাপ লাগছে। কিন্তু আজকে এ-বাড়িতে হলো কি? এমন হুড়দাড় করছে কারা? এতে কি কখনো ঘুম হয়?'

মা-সাপ বিঁড়ে পাকিয়ে বাচ্চাদের সব ক'টাকে বুকের তলায় ঘুম পাড়াচ্ছিলেন—ফিসফিসিয়ে বল্লেন, 'বাড়িতে যে আজ অনেক লোকজন এলো দেখলুম।

ছোটো ছেলেটা লেজ তিরতির ক'রে নাড়া দিয়ে বললো, 'হ্যাঁ বাবা, ছোটো ছোটো মানুষও আছে ওদের মধ্যে। একটা যে কী সুন্দর মেয়ে আছে—সে বোধহয় আমার সমান।'

চিন্তিত মুখে তার বাবা জবাব দিলেন, 'মানুষগুলো শুনেছি লোক ভালো না—বাবা বলতেন, ও-জাতকে বিশ্বাস করতে নেই! কী জানি আবার আমাদের উপর না ওদের সুদৃষ্টি পড়ে!'

মা'র একটু তন্দ্রা এসেছিল বোধ হয়, বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমার আবার সবেতেই একটু বেশি বেশি চিন্তা আছে। কেন, মানুষরা মন্দ লোক কী? আমার তো বেশ লাগে। ঐ তো সেবার এক গিন্নী এসেছিলেন এখানে—এই সিন্দুকটার উপর তাঁর নাতিকে নিয়ে রোজ বসতেন এসে রোদ পোহাতে, কোনোদিন তো কিচ্ছু বলেননি আমাকে। এই বারান্দার কোণে তো কতকাল থেকে এটা পড়ে আছে, আমরাও আছি। এই তো পাশের ঘরেই সেবার গিন্নীর ছোটো ছেলে শুতো, কতদিন বর্ষার রাত্তিরে আমি ঘরে গিয়েছি, শুয়ে থেকেছি খাটের তলায় ট্রাঙ্কটার পেছনে—কিছু বলেনি তো!'

সাপিনীর বড়ো ছেলে—সবে সে বেশ বড়ো-সড়ো হয়ে উঠেছে; তার কালো আর শাদা চামড়ায় উজ্জ্বল রং ধরেছে, আর মাথার ফণা চাটালো

হয়েছে অন্তত তিন আঙুল। সে অনেক খবর রাখে। মা'র কথায় হেসে বললো, 'মা, তুমি নিতান্তই ভালোমানুষ। তুমি ভাবতেই পারো না মনুষ্য-জাতটা কী অসাধারণ খারাপ! তুমি কি ভেবেছ তোমাকে দেখতে পেয়েও ওরা কিছু করেনি? আসলে অত রাত্রিতে যখন তুমি ঢুকতে আর ভোরবেলা যখন তুমি বেরুতে, কোনো সময়েই ওরা জেগে থাকতো না। দেখছো না কেমন লড়াই লেগেছে ওদের মধ্যে! ভারি স্বার্থপর জাত ওরা। আর এত নিষ্ঠুর যে কাউকে আঘাত করতেই ওরা দ্বিধা করে না, তা তুমি কিছু করো আর নাই করো।'

বড়ো মেয়ে এতক্ষণ চুপ ক'রেই ছিলো, এবার বললো, 'দাদা যা বলেছে, ঠিক বলেছে মা! ভারি লোভী জাত এরা। আমার সই হাস্নুহানা তো দুচারবার শহরেও গেছে। সে বলে যে ওরা অকারণে একজন আর একজনকে মারে। ও স্বচক্ষে দেখেছে যে একজন কেবল বসে-বসেই এতগুলো খায়, আর-একজন রাতদিন ভূতুড়ে খাটুনি খেটেও পেট ভরে খেতে পায় না। হ্যাঁ মা, আমাদের মধ্যে তো তা নেই—আমরা ঝোপেঝাড়ে, বনে-বাদাড়ে যে যতটা পারি খেয়ে আসি, কেউ বাধা দেয় না।'

মা ভালো করে বিঁড়ে পাকাতে পাকাতে বললো, 'তা বাপু তোমরা যাই বলো—ওদের উপর আমার দস্তুরমতো মায়া হয়। ঐ তো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শরীর কিন্তু আছে আমাদের মতো বিষ? কেমন করে যে সংসারে ওরা বেঁচে আছে, আশ্চর্য! এই তো দেখ বাড়ি-ঘর তো এখন গিশগিশ করছে লোকে—আমরা সবাই মিলে যদি যাই ঘরে আর গায়ে বিষ ঢেলে আসি, তাহ'লে কি হবে ওদের দশা তা ভেবেছিস? ঘুমুচ্ছে তো এখন সব —কিচ্ছু জানতেও পারবে না আমরা ঢুকলে।

ছেলে বললো, 'তা হলে চলো—একজনকে অন্তত—

অমনি বাধা দিয়ে বাবা বল্লেন, 'ছি ছি ছি! এমন নীচ মন তোমার? তোমাকে যতক্ষণ না আঘাত করবে, কেন তুমি তার আগেই নিজের

ক্ষমতার অপব্যবহার করবে? পরমপিতা মহানাগ ক্ষমতা দিয়েছেন আত্ম-রক্ষার জন্য—ধ্বংস করবার জন্য নয়।'

মা বললেন, 'এত লোক কিন্তু আর কখনো দেখিনি, আছি ত কম দিন না—এই সিন্দুক হ'ল আমার শ্বশুরের আমলের!'

'এরা যে সব ঈভ্যাকুঈ মা, বোমার ভয়ে পলাতক!'

বাপ-মা ছেলের বিদ্যে দেখে হাঁ হয়ে গেলেন—বুঝলেন না কিচ্ছু। মা কেবল বল্লেন, 'যাকগে, রাত অনেক হ'লো, এবার ঘুমুই কিন্তু বাবা দেখিস রাগের মাথায় আবার কাউকে কামড়ে-টামড়ে দিস না। ওরাও আছে, আমরাও থাকি—ঝগড়াঝাঁটির দরকারটা কি?

তখনকার মতো সাপ-পরিবার নিশ্চিন্ত মনে ঘুম দিল। শেষ-রাত্তিরে বাবা-সাপ আর বড়ো-বড়ো ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে গেলো খাবারের সন্ধানে—ছোটো তিনটি বাচ্চা ও গোটাকয়েক আফোটা ডিম বুকের তলায় করে মা রইলো ঘর আগলে। ভাবতে লাগলো কবে ফুটবে এই ডিম ক'টা আর কবে ওরা আর একটু চলতে ফিরতে পারবে নিজের হাতে পায়ে! গভীর মমতায় সাপিনী নিজের জিভ বুলিয়ে দিল বাচ্চা কটার গায়ে। এরা ভারি মা-ন্যাওটা!

সাপিনী ভাবলো, 'আরো তো কত বাচ্চা আছে ওদের বন্ধুদের মধ্যে, তারা তো বেশ মা ছেড়ে খেলা-টেলা করে বেড়ায়—এরাই কেবল মা-মা করে! আর এমন করলে এদের ছেড়ে থাকা যায়?'

ভাবতে ভাবতে সাপিনী মাথা গুঁজলো বাচ্চাদের মধ্যে।

রাত্রে কী জানি কেন, ভালো ক'রে সে ঘুমুতে পারেনি। মনটা যেন কেমন করেছে! মাথা গুঁজতে-না-গুঁজতেই সে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকাল বেলা হঠাৎ একটা শব্দে সে চমকে দেখলো—বাক্সের ডালাটি একটু ফাঁক ক'রেই একটা দুশমন চেহারার লোক দৌড়ে পালিয়ে গেলো—

সঙ্গে সঙ্গে কলরব করতে করতে আরো একদল লোক দৌড়ে এলো লাঠি-সোটা নিয়ে।

সাপিনীর বুকের মধ্যে ধ্বক-ধ্বক করতে লাগলো। তাড়াতাড়ি ঝাপটে সবাইকে বুকের তলায় টেনে নিয়ে, মাথা তুলে দাঁড়ালো সে। প্রায় দশ আঙুল চওড়া ফণা তুলে এপাশে ওপাশে দুলতে লাগলো বাক্সের মধ্যে।

সিন্দুকটার একটা কোণ নিচের দিকে ভাঙা, কিন্তু এতগুলো সন্তান ফেলে সে পালাবে কেমন কোরে? অস্ফুটে সে বললো, 'ওগো মানুষ, মেরো না আমাদের। আমরা তোমাদের কতকালের প্রতিবেশী—কোনো তো ক্ষতি করিনি কখনো! তোমাদের পায়ে পড়ি, মেরো না—ওগো মেরো না।'

দূর থেকে একটা লাঠি দিয়ে একটা লোক আবার তুলে ধরলো বাক্সের ডালাটা, সঙ্গে সঙ্গে ঠাস ক'রে একটা বাড়ি পড়লো সাপিনীর মাথায়।

অব্যক্ত যন্ত্রণায় মাথাটা সে দু'বার ঝাড়া দিয়ে বাক্সের গায়েই ছোবল মারতে লাগলো। আর বাচ্চাগুলো ভয়ে মা'র বুকের মধ্যে আরো জোরে আঁকড়ে রইল।

শব্দ উঠলো, 'মার! মার! তেজ কত ছাখ্ না—ঈস্, কি চাটালো ফণা!'

সাপিনী তার পাথরের মতো আশ্চর্য সুন্দর চোখ মেলে তাকালো মানুষের দিকে—তার বোবা ভাষায় সে বললো, 'আমাকে মারা আজ অতি সহজ। হে মানুষ, তোমরা ভাবছো এটা খুব বীরত্ব হ'লো, কিন্তু তোমরা জানো না আজ আমি মাতৃত্বের দায়ে বন্দী! সন্তানের মমতায় আবদ্ধ আছি, নইলে কখন বেরিয়ে আসতাম ঐ সুড়ঙ্গ-পথে, সর্বনাশ করতে পারতাম তোমাদের। একবার যদি আমি বাইরে এসে দাঁড়াতাম, সাধ্য ছিলো আমাকে তোমরা মারতে পারো? কিন্তু—'

ঠাস! ঠাস!—

প্রকাণ্ড লম্বা এক ভারি লাঠির আঘাতে নুয়ে পড়লো সাপিনীর মাথা। জানি না তার কণ্ঠে শব্দ থাকলে কত বড় আর্তনাদ আজ বেরুতো সেখান

থেকে। কেবল দেখা গেলো, তার মুখের ছু'পাশে একটু-একটু রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। অসহ্য যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর মুচড়ে-ছুমড়ে সে একাকার করে ফেললে—তারি মধ্যে নিচু হ'য়ে সে শেষ চুম্বন করলো তার প্রাণতুল্য সন্তানদের।

টেনে তোলা হ'লো তার পাঁচ হাত লম্বা মসৃণ সিল্কের মতো অপূর্ব সুন্দর শরীর—কিলকিল ক'রে উঠলো বাচ্চাগুলো—'মা গেলো কোথায় ?'

একটু বড়ো বাচ্চাটা আকুল হ'য়ে ছোট্ট মাথাটি তুলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলো। কিন্তু তাদের আয়ুও মানুষের হাতে শেষ হ'য়ে গেলো কয়েক মুহূর্তের মধ্যে।

অনেক রাত্রে বড়ো ছেলেমেয়েরা আর বাবা-সাপ ফিরে এসে আর দেখতে পেলো না তাদের নির্দিষ্ট বাসস্থান। ছেলেমেয়েরা গুমরে উঠলো 'মা, মা' ব'লে। যুবক ছেলেটি কাঁদতে-কাঁদতে বললো, 'নিষ্ঠুর মানুষগুলো নিশ্চয়ই আমার মাকে আর ভাইবোনদের মেরে ফেলেছে !'

কেঁদে-কেঁদে তারা অবশেষে উঠোনের এক কোণে দেখতে পেলো তাদের সেই সিন্দুকটা ডালা-ভাঙা হ'য়ে প'ড়ে আছে উপুড় হ'য়ে।

এবার বাবা-সাপটাও কেঁদে উঠলো ছুঃসহ কষ্টে। তারপর সংযত হ'য়ে লেজে ভর ক'রে সে সমস্ত শরীরটা প্রায় মাটি থেকে তুলে ফেললে—চোখ-মুখ জ্ব'লে উঠলো প্রতিহিংসার জ্বালায়। গম্ভীর স্বরে বললো, 'বাবা, তোমরা সব দেখলে তো মানুষের শঠতা, নিষ্ঠুরতা ! কতকাল ধ'রে প্রতিবেশী হ'য়ে বাস করছি এখানে—মুখের কাছে ব'সে কত শিশুকে দেখেছি খেলা করতে, কত বড়োরা এসে বসেছে এখানে—তোমার মা ভুলেও সেদিকে তাকাননি—এক-আধ সময় তোমরা একটু তিড়িং-বিড়িং করেছ—আর অমনি তোমার মা তোমাদের শাসন করেছেন। দেখলে তো তার ফল ? তোমরা যাও—কিন্তু আমি নড়বো না এ-বাড়ি থেকে। দেখি আমিও কাঁদাতে পারি কিনা !'

এই ব'লে সাপটা প্রবলবেগে ফণা আছড়াতে লাগলো মাটিতে।

সাতদিন ধ'রে ক্রমাগত চেষ্টা ক'রে-করেও সাপটা একটা সাবালক মানুষকে বাগে পেল না। ছোটোদের ছু'দিন পেয়েছিল একেবারে মুখের কাছে, কিন্তু তারা যে ছোটো! তারা কী জানে? সাপটার নিজেরও তো ছেলেমেয়ে আছে? কিছুতেই বিষ ঢালতে পারেনি তাদের শরীরে।

ক'দিন পরে কাল রাত্রিতে বৃষ্টি হয়েছিলো—আজকের আকাশ ভারি সুন্দর। বাঁধানো পুকুরের ধারে এসে থামলো সাপটা—আঃ, কী মিষ্টি গন্ধ আসছে! নিশ্চয়ই কেয়া ফুটেছে আজ! টলমল করছে পুকুরের জল—সাপের মনটা কেমন স্নিগ্ধ আরামে ভ'রে উঠলো। ক'দিনে তার শোকটাও একটু উপশমিত হ'য়ে এসেছিলো। কেয়ার ঝোপে এসে বসলো সে।

ফুলের গন্ধে মন-প্রাণ তার আকুল হ'য়ে গেলো—মনে মনে ভাবলো—'ঈশ্বর কত আনন্দ দিয়েছেন পৃথিবীতে—কেন আমরা দুঃখ পাই, ক'দিনেরই বা জীবন? না, কোনো গ্লানি মনে রাখবো না—কোন প্রতিশোধ চাই না আমি—যারা গেছে তারা যাক—তারা শান্তি পাক—ক'দিন পরে তো আমিও যাবো সেখানে।'

এর মধ্যেই কেয়া-ঝোপের একটু দূরে ছু'খানি পা এসে থামলো। শক্ত সমর্থ পা। সাপের চোখটা একটু চিকচিক ক'রে উঠেই থেমে গেলো—নাঃ! আজ আর কাউকে হিংসা করবে না।

স্তব্ধ হ'য়ে সে তাকিয়ে রইলো সেদিকে।

মানুষটি এসে বসলো ঘাটের সিঁড়িতে—তারই দিকে পেছন ফিরে। তারপর পকেট থেকে বার করলো একটা বাঁশের বাঁশি, আর তাতে সুর দিতেই আকুল হ'য়ে উঠলো সাপ।

এক মিনিট, ছু'মিনিট, তিন মিনিট—দশ, পনরো—আধঘণ্টা ধ'রে বেজে চললো বাঁশি—উন্মনা হয়ে ঝোপ থেকে সে বেরিয়ে এলো। তার

খেয়াল রইলো না এটা রাত্রি নয়, দিন, এটা স্বর্গ নয়, পৃথিবী। এখানে চলে হানাহানি, হিংসার দ্বন্দ্ব।

সমস্ত ভুলে গেলো সে বাঁশি শুনে—কিন্তু কতক্ষণ সে অমন তন্ময় ছিলো সে-সময়ের হিসেব তার মনে নেই। হঠাৎ একটা অসহ্য আঘাতে ভেঙে গেলো তার কোমর—স্বপ্নের স্বর্গ থেকে এবার আর্তনাদ ক'রে নেমে এলো সে শত্রু-সংকুল পৃথিবীর মাটিতে। রাগে, দুঃখে, ব্যথায় জর্জরিত হ'য়ে চেষ্টা করলো সে দৌড়ে পালাতে, কিন্তু কোমর তার ভেঙে গেছে। বাড়িসুদ্ধ লোক ভেঙে পড়লো তাকে দেখতে—তার অসহ্য ব্যথা কেউ বুঝলো না—তারা দেখলো শোভা, দেখলো মজা!



...ভাষাহীন যন্ত্রণায় ফণা তুলে কাঁপলো

সে যখন ভাষাহীন যন্ত্রণায় ফণা তুলে কাঁপলো, যন্ত্রণায় নিজের সর্বশরীর কামড়ালো—দু'চোখ দিয়ে কত আবেদন জানালো—তখন সবাই হাততালি দিয়ে দেখতে লাগলো তার খেলা। তারপর সেখানে একটা তরল কী জিনিস ঢেলে তাতে জ্বালিয়ে দিলো আগুন। ধীরে-ধীরে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল তার অপূর্ব দেহ-সুষমা।

বড়োপিসির ছোটোছেলে

মিন্নুর আজ মন ভালো না। বড়োপিসির বাচ্চাটাকে দেখে থেকেই যে কেমন ভার হ'য়ে আছে, কিছুতেই যেন আর হালকা হচ্ছে না। সবটাতেই তাই আজ তার রাগ আর বিরক্তি।

মা বললেন, 'কী রে, আজ তোর হ'লো কী? এই দেখি দু'দিন ধরে কখন বড়োপিসি আসবে সেই আশায় লাফাচ্ছিলি, এখন তো কই একবার কাছেও এলি না!'

বড়োপিসি হেসে বললেন, 'ছোটোপিসিই ওর আসল পিসি, আর আমি ত নেহাত পর, না রে?'

'তা বাবা ও তোমাকে বড়ো হ'য়ে দেখেছেই বা কতটুকু! তুমি ত বছরে একবার আসবারও সময় পাও না!' মিন্নুর মা অনুযোগ করবার সুযোগটুকু ছাড়লেন না।

কথাটা সত্যি। তিনি আসেন খুব কম। মস্ত তাঁর সংসার, সময় সুযোগ আর হয়ই না। এও নিতান্তই পুজো উপলক্ষ্যে মিন্নুর বাবা জোর ক'রে নিয়ে এসেছেন। তাও মাত্র দু'দিনের জন্য। বাচ্চা-কাচ্চাদেরও সব আনেননি। কেবল কোলেরটি, যেটা মিন্নুর ছোটপিসির ছেলের সমান, সেটিকে এনেছেন। মাথাভরা তার কালো-কালো কোঁকড়া চুল, ফুটফুটে ফরসা গায়ের রং, অর্থাৎ মিন্নুর ছোটোপিসির ছেলেটি যত কালো এ যেন তত ফরসা···তার মাথায় যত কম চুল এর যেন ততই ঘন। বাড়ীর সকলে তাকে নিয়ে একেবারে লোফালুফি করতে লাগলো।

অণিমা—মানে মিন্নুর ছোটোপিসি—মাত্র দু'বছর বিয়ে হয়েছে তার—আর এই ছেলেই তার প্রথম। শ্বশুরবাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়ী, দেওর ননদ, বড়ো-বড়ো জায়েরা—একেবারে ভর্তি বাড়ি, কাজেই দায়িত্ব কম। ঘন-ঘন বাপের বাড়ি আসায় কোনো অসুবিধে নেই তার। তা ছাড়া মিন্নুর বাবা

সকলের ছোটো এই বোনটিকে বোধ হয় বেশিদিন না-দেখেও থাকতে পারেন না, তাই কয়েকমাস না-এলেই তাড়াতাড়ি আনতে ছোটেন। ছেলে হ'য়ে শরীর খারাপ হয়েছে ব'লে দু'মাস যাবৎ এসে আছে এখানে। এই পিসির তুলনায়—বড়োপিসি যে নিতান্তই দূরের মানুষ সে বিষয়ে আর সন্দেহ কী? অথচ তার নিজের পিসির ছেলের চাইতে এই পর-পিসির ছেলেটি যে এত সুন্দর হবে তা মিনু কেমন করে সহ্য করে? সারাদিন



…মনের কথাটা সমবয়সী মোক্ষদা-ঝির মেয়ের কাছেই খুলে বললো

ধ'রে তাই ভারি বিচলিত হ'য়ে আছে সে। যতবার মিলিয়ে-মিলিয়ে দেখছে, ততবারই মন তার খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। কী করবে সে? এখন সে কি করে?

অবশেষে সইতে না পেরে মনের কথাটা তার একমাত্র সমবয়সী মোক্ষদা-ঝির মেয়ের কাছেই খুলে বললো, 'আচ্ছা পেঁচি, তুই সত্যি করে বল তো, ছোটোপিসির ছেলেই দেখতে ভালো, না বড়পিসির ছেলে?'

'ওমা, সে আবার বলতে!' পেঁচি চোখ বড়ো করলো, 'বড়োপিসিমার ছেলে কী ফরসা, কী মোটা—'

'হ্যাঃ, তুই জানিস! ফরসা আর মোটা হ'লেই বুঝি সুন্দর হয়?'

'নিশ্চয়!'

'কক্ষনো না!'

'ইঃ তুমি বললেই যেন হ'লো। জিগ্যেস করো না সকলকে।'

'যা' যা, ভাগ এখান থেকে। সকলে আবার কী জানে রে?'

ভীষণ বিরক্ত হলো মিনু, তারপর হঠাৎ পেঁচিকে এক ধাক্কা মেরে ঠেলে ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেলো সেখান থেকে। সোজা গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসলো চিলকুঠির ছাতে। দার্শনিকের মতো ভুরু কুঁচকে নখ খেতে-খেতে তৎক্ষণাৎ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হ'য়ে গেল।

বড়োপিসি আজই যাবেন রাত বারোটার গাড়িতে। মাত্রই দু'দিনের মেয়াদ, ভালো করে একটু সুখদুঃখের কথাও বলা গেলো না কারো সঙ্গে। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলেন। দুধ খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে নিচের ঘরে মিনুদের মশারির তলায় শুইয়ে রাখলেন বাচ্চাকে, তারপর বাকি সময়টুকু কথাবার্তাতেই কেটে গেল। ইলেকট্রিকের সংশ্রব-বর্জিত গ্রামের মতো জায়গা, অল্প রাত্রেই বেশি রাত্রের নিস্তব্ধতা নামে। এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় শেয়াল ডেকে উঠলো ক'বার, ঝিঁঝিঁর ডাক আরো তীব্র হ'লো। উঠে-উঠে বারে-বারে ঘড়ি দেখতে লাগলেন পিসিমা, শেষে নির্দিষ্ট সময়ে ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়ালো দরজায়। বাচ্চাকে চাপাচুপি দিয়ে মশারির তলা থেকে বার ক'রে নিয়ে এলেন মিনুর মা, বললেন, 'আবার একবার সময় ক'রে লক্ষীপুজোর পরে এসো ঠাকুরঝি—আর কার্তিক মাসের হিম, দেখো, ছেলেটার ঠাণ্ডা না লাগে!'

মিনু শুয়েছিলো, কিন্তু জেগে ছিলো। সবাই ভাবলো ঘুমুচ্ছে, কেউ তাই ডাকলো না। আস্তে-আস্তে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠলেন পিসিমা,

গাড়ি ছাড়লো—শেষে গাড়ির আওয়াজ যখন মিলিয়ে গেল, লণ্ঠন নিবিয়ে মা-বাবা শুলেন এসে তার কাছে, আর ছোটোপিসি গেল দোতলায় নিজের ঘরে। মিনু কিন্তু তখনো জেগে। কেউ টের পেলো না সে-কথা। আরো অনেকক্ষণ জেগে রইলো মিনু। নেবানো-লণ্ঠনের কেরোসিন-গন্ধ নাকে লাগলো তার, তারপর কখন তন্দ্রা এলো।

বেশিক্ষণ না। একঘণ্টাও হবে কিনা সন্দেহ, আবার ঘোড়ার খুরের আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে একপাল কুকুরের চীৎকার শোনা গেল পাড়ায়। আর আশ্চর্য এই, তক্ষুনি ঘুম ভেঙে গেল মিনুর। অমনি কান খাড়া করলো সে। হঠাৎ একটা যেন ভয় নেমে এলো তার বুকে। ঠিক। যা ভেবেছিলো ঠিক তাই। গাড়ি এসে তাদের দরজাতেই থামলো। একটু পরে তাদেরই দরজার কড়া নড়ে উঠলো খটরখটর ক'রে। এদিকে এইটুকু সময়ের মধ্যেই গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছেন মা বাবা। জোরে-জোরে কড়া নড়তে লাগলো, তবু তাঁরা ঘুমুতেই লাগলেন। মিনু চুপ। শেষে ডাক এলো জোরে-জোরে, 'দাদা, ও দাদা, মিনু, মিনু, বৌদি!'—সঙ্গে-সঙ্গে ধাক্কা। এতক্ষণে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন মা বাবা। বাবা তক্ষুনি গেলেন দরজা খুলতে, আর মা মশারির তলা থেকে বেরিয়ে হাতড়ে-হাতড়ে লণ্ঠন জ্বালতে বসলেন। ওপরের ঘরে হঠাৎ চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো মিনুর ছোটোপিসির ছেলে—ঘুমচোখে অণিমা চাপড়াচ্ছে ছেলেকে, নিচে থেকেই তার শব্দ পেলো মিনু। ছেলে কিন্তু থামে না। পাঁচমাসের বাচ্চার গলায় কী জোর! লণ্ঠন জ্বালতে-জ্বালতে মিনুর মা বললেন 'ইশ, কী কাঁদছে ছেলেটা!'

দরজা খুলে দিয়ে বোনকে দেখে মিনুর বাবা তো অবাক!

'কী রে, ব্যাপার কী? ফিরে এলি যে?'

এলাম কি সাধে? আর-একটু হ'লে কী কাণ্ডই হ'তো দাদা!'

লণ্ঠন হাতে মিনুর মা দাঁড়ালেন গিয়ে। 'কী হয়েছে ঠাকুরঝি?'

'অণু কী করছে বলো আগে।'

'কেন ?'

'ছেলে যে কাঁদছে ও কি শুনছে না ?'

'ও, তাই বলো !' মিনুর মা আশ্বস্ত হ'লেন। 'শুনছে না। আমাদের কান ফেটে যাচ্ছে—আর ও শুনছে না ?'

'তাকে ডাকো। ছেলে নিয়ে নিচে আসতে বলো, ওর কি ধারণা ওই-ছেলে ওর কাছে থামবে ?'

'হয়েছে কী বলো তো ?' মিনুর বাবা অস্থির হ'য়ে বললেন।

'এই ছাখো !'

বড়োপিসি কী দেখালেন কে জানে। মিনু তো দেখছে না, মিনু তো কেবল শুনছে। কিন্তু সেই শুনেই তার হাত-পা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগলো।

'ও মা, সে কী !'

'এ কী অসম্ভব কাণ্ড।'

'তবে বলছি কী ? আরে, আমি তো জানতেই পারতাম না কিছু।' বড়োপিসি বললেন, 'গাড়িতেও উঠে বসেছিলাম, তারপর গাড়ি যখন ছাড়ে-ছাড়ে, হঠাৎ বাচ্চাটা কেঁদে উঠলো একটা হুইসিলের শব্দ শুনে—আর কান্না শুনেই চমকে চেয়ে দেখি, এই ! আমি তো একেবারে থ ! —হুড়োহুড়ি ক'রে গাড়ি থেকে যে কী ক'রে নেমেছি !'

তিন লাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে নেমে এলো অণিমা। কোলে তার ছেলে ঝুলছে, আর চীৎকার করছে পাড়া ফাটিয়ে।

'ও বৌদি ! বৌদি ! ছাখো কী সর্বনাশ হয়েছে !' তার গলার স্বর শুনে মনে হ'লো, ভয়ে ভাবনায় কান্নায় এক্ষুনি যেন ভেঙে পড়বে সে।

'কেন, কী হয়েছে ?' একটু হাসলেন মিনুর মা। ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে এগিয়ে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো অণিমা, তারপর আনন্দে আকুল হ'য়ে উঠলো বড়দিকে দেখে।

'ওমা, তুমি! তুমি ফিরে এসেছ তাহ'লে? ইশ, আমার বুকটা যে কী-রকম করছে! কী হ'তো চ'লে গেলে!'

'কী হ'তো চলে গেলে!' মনে-মনে ছোটোপিসিকে ভেঙচিয়ে উঠলো মিনু। বুকের মধ্যে আবার কেমন করছে! ঢং! রাগে হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছে করলো তার। ছোটোপিসির মতো এমন একটা ক্যাবলা সে জন্মে ছ্যাখেনি।

'আচ্ছা, তুই কী বল তো!' নিজের ছেলেকে টেনে কোলে নিয়ে শান্ত করতে-করতে বড়োপিসিমা বললেন, 'কান্না শুনেও বুঝিস না?'

'ঘুমের মধ্যে বুঝবো কী ছাই, তাছাড়া এমন একটা কথা মানুষে ভাবতে পারে?'

বড়োপিসির ছেলে মায়ের গন্ধ পেয়ে তক্ষুনি চুপ করলো আর অণিমা নিজের ঘুমুনো ছেলের কালো গালে অজস্র আদর বর্ষণ করতে-করতে হেসে উঠলো জোরে।

মিনুর বাবা অবাক হ'য়ে বললেন, 'হ্যাঁ রে অণি, তোর ছেলে ঘুমোলো দোতলার ঘরে আর ওর ছেলে একতলায় আমার বিছানায়, কী ক'রে এই ব্যাপারটা হ'লো বল দেখি?'

'সত্যি! আমিও তাই ভাবছি। অণিমার ছেলে তো সেই সন্ধে থেকে ঘুমুচ্ছে। নিচে আর নামেইনি মোটে, আর বড়োঠাকুরঝির ছেলেকে শোওয়ালো রাত দশটায়, কী ক'রে ওপরেরটি নিচে আর নিচেরটি উপরে গিয়ে হাজির হ'লো বল তো? বাচ্চা দুটো পরী নাকি?'

'সত্যি!'

'সত্যি!'

বিছানায় চোখ টিপে তখন প্রাণপণে ঘুমের চেষ্টা করছে মিনু। বড়োদের মত বোকা সত্যি আর দেখেনি সে। ভালো করলে ভালো চায় না, কেবল খুঁতখুঁত! এ কেমনতর স্বভাব। আড়ি! আড়ি! আড়ি! জন্মের মতো আড়ি ছোটোপিসির সঙ্গে।

মোক্ষদা-ঝি এতক্ষণে উঠে এলো চোখ রগড়াতে-রগড়াতে। 'ও মা, সি কী গো, বড়দিদিমণি ফিরে আইলে যে?'

'এ মোক্ষদারই কাণ্ড! ও মোক্ষদা—' এতক্ষণে খেই পেলো অণিমা। 'বাচ্চা বদল করেছে কে গো?'

'বাচ্চা বদল? এ আবার কী কথা?'

'কী আবার! উপরের বাচ্চা নিচে আর নিচের বাচ্চা উপরে। কে করলো এ কাণ্ড?'

'বলছো কী তোমরা? আমি তো বাপু কিছুই বুঝতে পারছি না।' সত্যিই অবাক হ'লো সে।

'সত্যি তুমি জানো না কিছু?'

'সত্যি না!'

'ও দাদা, এ কী ভূতুড়ে কাণ্ড!'—অণিমা একটু ভিতু মানুষ, তার প্রায় গা ছমছম করতে লাগলো। 'তোমার মেয়েকে ডাকো দেখি মোক্ষদা!'

এইবার মিন্নু তড়াক ক'রে উঠে বসলো, কুলকুল ক'রে ঘাম নামলো তার পিঠ বেয়ে, হুড়মুড়িয়ে মশারি-টশারি ছিঁড়ে খাটের তলায় গিয়ে ঢুকলো সে। এই অন্ধকারে খাটের তলা! কী ভীষণ ভাবো! খাটের উপরে ব'সে যে-মানুষ খাটের তলার ভয়ে পা ঝোলায় না, সে-মানুষ এমন অকাতরে ঢুকে গেলো সেখানে! আর সেই তলাও কি যেমন-তেমন তলা? ট্রাঙ্কে, বাক্সে, বাসনে, বিছানায় মশার গানে—একখানা জাদুঘর একেবারে। ক'টা চোর আর ক'টা ভূতের ছানা যে লুকিয়ে আছে সেখানে তার ঠিক আছে কিছু? কিন্তু কী করা! তার আর এখন ভয়ডর কী! বাড়ির লোক হ'য়েও এরা এখন তার যত শত্রু, তার চেয়ে আর কে বেশি। এদের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে যে ভূতের পেটে যাওয়াও অনেক ভালো। কিন্তু ছোটোপিসিটা কী রে? ক্যাবলা, একদম ক্যাবলা!

মোক্ষদার মেয়ে উঠে এলো ঘুমে ঢুলতে-ঢুলতে। মিন্নুর বাবা বললেন, 'এই বড়োপিসিমার ছেলেকে উপরে নিয়ে, ছোটপিসিমার ছেলেকে নিচে এনে শুইয়েছে কে রে?'

'আমি জানি না।' তার কান্না প্রায় পড়ো-পড়ো।

'জানিস না মানে? ঠিক ক'রে বল।' ধমক দিলেন মিন্নুর বাবা।

অণিমা বললো, 'আমার কিন্তু ভাই একটা কথা মনে হচ্ছে।' এ-কথা শুনে খাটের তলায় মশার কামড় খেতে-খেতে কেঁপে উঠলো মিন্নু।

বেশি জেরা করতে হ'লো না। একটু পরেই নাকিসুরে সব কথা ফাঁস করে দিলো পেঁচি।

বেচারা মিন্নু! একেবারে যেন মরমে মরে গেল। ইশ! পেঁচিটাকে একবার হাতের কাছে পেলে হয়। এই মিথ্যাবাদীটাকে কিছু না জানানোই উচিত ছিলো তার। কিন্তু বলেছে কি ইচ্ছে ক'রে? তার সাধ্য কি, বড়োপিসির অতবড়ো ভারি ভোটকা ছেলেটাকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে সে একা ওপরে ওঠে। আর ছোটপিসিকেও বলিহারী যাই, এই নেড়া কালো ছেলেটাই কি তার অমন সুন্দর ছেলেটার চাইতে ভাল হ'লো? বড়োপিসিমা যখন ফিরে এলেন তখন বললেই হ'তো—না বাপু, আর আমি এই ছেলে ফিরিয়ে দেবো না। মা বাবাই বা কেমন?

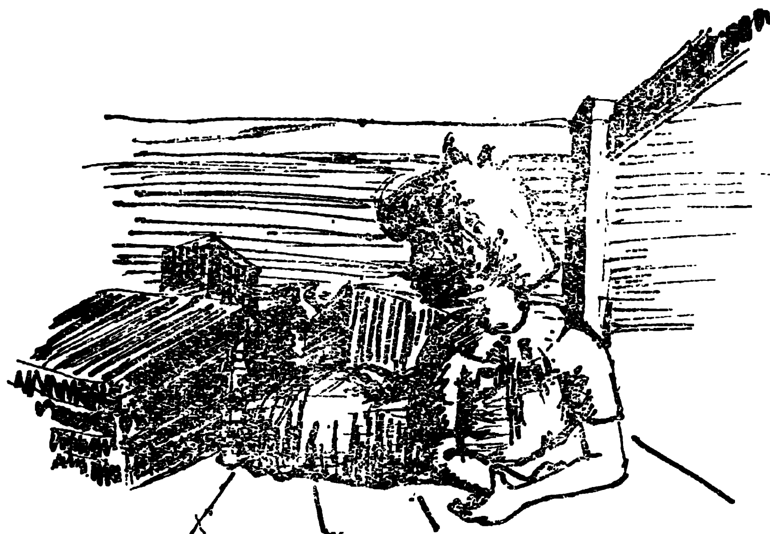


নাকিসুরে সব কথা ফাঁস করে দিল পেঁচি

একরাশি হাসি শুনে হঠাৎ মিন্নু চমকে উঠলো। রাত দুপুরের স্তব্ধ বাড়ি ভেঙে খানখান্ হ'য়ে গেল মা-বাবা আর পিসিদের হাসিতে।

'ও মিনু, মিনু'—হাসতে হাসতেই ছুটে এলেন ছোটোপিসি—এলেন বড়োপিসিমা, মা, বাবা, মোক্ষদা সব। মিনু কই?

মিনু খাটের তলায় বড়ো-বড়ো নিশ্বাস নিচ্ছে চোখ বুজে। বুকের ভিতর যেন একটা ইঞ্জিন চলেছে ধকধক করে পুরো দমে। এমন লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা, মনে হলো এক্ষুনি বা ফেটে যায়। যাক। যাক! ফেটে



...একরাশি হাসি শুনে মিনু চমকে উঠলো

গেলেই সে বাঁচে! তার ম'রে যাওয়াই ভালো। হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ে ভয়ে একেবারে হিম হ'য়ে গেল সে। হায়! হায়! বড়ো-পিসেমশায় যে পুলিশের দারোগা—আর তার ছেলেই চুরি? কী হবে?

এইবার আর পারলো না মিনু। লজ্জা সরম সমস্ত ভুলে সেই খাটের তলা থেকেই প্রকাণ্ড জোরে 'ভ্যাঁ' ক'রে কেঁদে উঠলো।